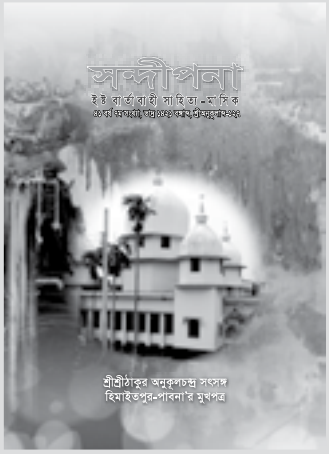

সম্পাদক
ড. শ্রীরবীন্দ্রনাথ সরকার

সম্পাদনা সহযোগী
শ্রীতাপসকুমার রায়
tapas.satsang@gmail.com
tkroy@rocketmail.com

ঢাকা কার্যালয়
১৪০/১ শাঁখারী বাজার
ঢাকা-১১০০।

চট্টগ্রাম কার্যালয়
২৭ দেওয়ান্‌জী পুকুর লেন
রহমতগঞ্জ, চট্টগ্রাম।
ফোনঃ ০৩১-২৮৬০৭১১
মোবাইল: ০১৭১৪-৩১০২০৩
০১৮১৯-৩১২৫১৮

প্রধান কার্যালয়
শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ
হিমাইতপুর-পাবনা
ফোনঃ ০৭৩১-৬৫৫২৩, ৬৫১৬৪
মোবাইলঃ ০১৭১৫-৫৩৪২০৭ (সম্পাদক)
০১৯১১-৭৮৮১৩৯ (সম্পাদনা সহযোগী)
০১৭১৮-১৫২৩৪৪ (অফিস)
E-mail: satsanghimaitpur@yahoo.com

বাণিজ্যিক যোগাযোগ
শ্রীঅনিশচন্দ্র ঢালী
০১৭১৯-৭৫৩৪৭৪

প্রচ্ছদ ও পৃষ্ঠা সজ্জা
আমিনুল ইসলাম
প্রিন্ট মিডিয়া, প্রেসপট্টি, বগুড়া

সন্দীপনা

ই ষ্ট বা র্তা বা হী সা হি ত্য - মা সি ক

৪১ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ভাদ্র-১৪২১ বঙ্গাব্দ, আগস্ট-সেপ্টেম্বর'১৪ খ্রিঃ, শ্রীঅনুকূলাব্দ ১২৭

তুমি যেই হও না কেন,
সব সময়ই মনে রেখো,
মানুষের শাস্তা তুমি,
শাস্তা নওই,
শাসন যেখানে বিহিত প্রয়োজনীয় হ'য়ে উঠেছে
তা'ও কিন্তু তা'দের
সান্ত্বনা ও সমৃদ্ধির জন্যই,
আর তা' হওয়া চাই-ই,
কারণ, অস্তিত্বের আবেগই হ'চ্ছে
সব বিঘ্নকে অতিক্রম ক'রে
স্বস্তিতে স্বতঃ হ'য়ে ওঠা;
তোমার সাত্ত্বিক নিয়মন
যতই এমনতর হ'য়ে উঠবে,
স্বস্তিও ততই নন্দিত ক'রে তুলবে তোমাকে–
একটা সৎ-সন্দীপনী শ্রেয়ার্থ পরায়ণ অভিনন্দনায়। ১১২।

–শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

সূচিপত্র

দিব্যবাণী ঃ শ্রীশ্রীঠাকুর ৪
প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ৬
ইষ্টস্থান ও ইষ্টভৃতি নিয়ে ক'টি কথা ঃ ড. শ্রীরবীন্দ্রনাথ সরকার ৯
ওস্যান ইন এ টি-কাপঃ অনুবাদঃ শ্রীমতি ছবি গোস্বামী ১১
ছন্দে ছড়ায় জীবন আলো ঃ শ্রীশ্রীঠাকুর ১৪
মাতৃদীপনা- সেবা-বিধায়না ঃ শ্রীশ্রীঠাকুর ১৬
বাণী তব ধায় ঃ প্রীতিগোপাল দত্তরায় ১৮
চিরঞ্জীব বনৌষধী– রক্তচন্দন ঃ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী শ্রীশিবকালী ভট্টাচার্য্য ২২
ঈশ্বরবাদই জীবনকে সমৃদ্ধ করতে পারে ঃ শ্রীশীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার ২৪
যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ঃ ড. প্রজ্ঞারঞ্জন দত্ত, বিদ্যাবাচস্পতি ২৭
চাষ কর জীবন ভুঁই ঃ খগেন্দ্রনাথ কয়াল (অধ্বর্য্যু) ২৯
কবিতা/সঙ্গীত ৩১
গোত্র ও প্রবরের তালিকা ৩২
শ্রীশ্রীঠাকুর কথিত শব্দের ব্যাখ্যা ৩৪
প্রার্থনার সময় সূচী ৩৬

সম্পাদকীয়

অনুকূল জন্ম-জয়ন্তী

ভাদ্র মাসটি আমাদের কৃষ্টি, সভ্যতা তথা অস্তিত্বের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমণ্ডিত স্থান দখল করে আছে। এই মাসে দুইজন পরমপুরুষ বা পুরুষোত্তম ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন। একজন পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। অন্যজন শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমী তিথিতে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ও একই মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটে। শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথিকে জন্মাষ্টমী ও শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের জন্মতিথি তালনবমী তিথি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

এই দুই তথাগতের স্মৃতিধন্য ভাদ্র মাসে নানা উৎসব-অনুষ্ঠান আয়োজনে ভক্ত অনুরাগিরা ব্যস্ত সময় পার করেন। সৎসঙ্গের তরফে কেন্দ্রীয় আশ্রমসহ সারাদেশের শাখা কেন্দ্রগুলোতে মাসব্যপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। 'ভাদ্র পরিক্রমা' শিরোনামে ভক্ত অনুরাগিদের বাসস্থান, মন্দিরসহ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে বিনতি-প্রার্থনা, সদ্‌গ্রন্থাদি পাঠ ও আলোচনা, ভক্তিগীতি ইত্যাদি অনুষ্ঠানে পঠন-পাঠন-স্মরণ-মনন-ক্রিয়া চলে। আদর্শ প্রিয়পরমের বাণী ও বলার আলোকে নিজেদের ব্যক্তিজীবনকে পরিশুদ্ধ করার প্রয়াসী হয়। নিজেকে ইষ্টকাজের যোগ্য করে তোলায় ব্রতী হয়। আর জন্মাষ্টমী রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ভাবগম্ভীর পরিবেশে ভক্তিবিনম্র শ্রদ্ধায় উদ্‌যাপিত হয়। এদিন সরকারী ছুটিও থাকে।

মানুষের জীবন নানা সমস্যায় বিদীর্ণ থাকে। নানা প্রতিকূলতা জীবনের অনিবার্য বাস্তবতা হিসাবে হাজির হয়, কমবেশী সবারই। এসব প্রতিকূলতা, দুর্বলতা, গ্রন্থি নিয়েই আমাদের পথচলা। কিন্তু জীবনের কেন্দ্রে যদি থাকেন পুরুষোত্তম বা সর্বোত্তম পূরণ স্বভাব সম্পন্ন পুরুষ তবে সব প্রতিকূলতাই অনুকূল হয়ে ধরা দেয়। বাঁধার গ্রন্থি উন্মোচিত হয়। 'কিং কুর্ব্বন্তি গ্রহা সর্বে, যস্য কেন্দ্রে বৃহস্পতি।' জীবনের কেন্দ্রে যদি বৃহস্পতি বা ইষ্ট থাকেন, তবে কোন গ্রহবৈগুণ্য মানুষকে পর্যুদস্ত বা কাবু করতে পারে না। সে কারণে ইষ্ট নির্দেশের সঠিক ও অবিকল অনুসরণ-অনুশীলনে কোন গ্রন্থিই জীবনের স্বাভাবিক গতিপথকে রোধ বা পরাস্ত করতে পারে না। জয় ও যশের পথ স্বতই বেগবান হয়ে ওঠে।

'ইষ্টীচলন থাকেই যদি রুখবে না তোয় দুর্গতি
দুর্গতি তোর দুর্গ হয়ে আনবে জয়ে উন্নতি।'

আর জীবনপথে নানা গ্রন্থি বা গ্রহবৈগুণ্য জয়েরও পথ একটিই– গভীর ও একনিষ্ঠ ইষ্টটান।

'ইষ্ট টানের অমোঘ নেশায়
দেখবি অনেক গ্রহের ফের
খাবি খেয়ে পাল্টে গেছে
রেখে সৎ-এর ঝলক জের।'

পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ যেমন পবিত্র গ্রন্থ গীতায় অবতরণ মাহাত্ম্য বর্ণনায় বলেছেন–

'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানাং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাম্
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামী যুগে-যুগে।'

ধর্মের তথা বাঁচা-বাড়ার পথে গ্লানি বা প্রতিকূলতা সৃষ্টি হলে সাধুদিগের পরিত্রাণ ও দুষ্টগণের বিনাশ সাধনের জন্য তথাগত অবতার পুরুষ যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রও একই কথা বলেছেন আরো একটু ভিন্ন মাত্রায়। সময়ের বিবর্তনে, যুগের প্রয়োজনে। তিনি বললেন–

'ধর্ম যখনি বিপাকী বাহনে
ব্যর্থ অর্থে ধায়
পূরণ পুরুষ তখনি আসেন
পাপী পরিত্রাণ পায়।'

শ্রীশ্রীঠাকুর ধর্মকে জীবন-বৃদ্ধির যথার্থ পথ বলে বর্ণনা করেছেন। যে পথে চললে মানুষের সপরিববেশ বাঁচা-বাড়া নিরাবিল, নিরুদ্বিগ্ন থাকে, উন্নতির পথে চলা যায় তাই

ধর্মের পথ। এই বাঁচা-বাড়ার পথ যখনই বিপাকী বাহনে আবিলতাপূর্ণ হয়ে উঠে, তখনি পূরণপুরুষ এসে খাক্‌তি বা ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে মানুষকে সঠিক পথের নিশানা বাতলে দেন। বেপথু মানুষ তখন জীবন চালনায় যথার্থ পথ খুঁজে পায়, তার দুষ্ট প্রবৃত্তিরও বিনাশ ঘটে এভাবেই। ফলে সাধু-পাপী নির্বিশেষে সকল মানুষই জীবন পথের সঠিক দিশা পেয়ে পরিত্রাণ লাভ করে। বৃত্তি-প্রবৃত্তির নাগপাশ থেকে মুক্তি পায়।

'গুরুই ভগবানের সাকার মূর্ত্তি'। মানুষের বৃত্তি-প্রবৃত্তির ইন্ধনরূপী যে গেরো বা গ্রন্থি তা থেকে গুরুদত্ত কর্ম সম্পাদন করেই কেবল নিস্কৃতি লাভ করা যায়।

'বিপাক পথে হাত ধরে যে
চলার কায়দা জানিয়ে দেয়,
তাঁকেই জানিস গুরু বলে
অভয় পথে সেই তো নেয়।'

কাজেই বর্তমান যুগপুরুষোত্তম শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের মতাদর্শে সম্যক দীক্ষা নিয়ে তাঁর দেওয়া নীতি-বিধির অবিকল অনুসরণে মানুষ যথার্থ মুক্তির আস্বাদ লাভ করে। জীবনকে যথার্থ উপভোগেও সক্ষম হয়।

১৬, ১৭ ও ১৮ ভাদ্র এই তিনদিনব্যপী পরমতীর্থ হিমাইতপুরধামে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ১২৭তম জন্মজয়ন্তী উৎসব সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হল। দেশ-বিদেশের বহু ভক্ত সমাগমে পুণ্যভূমিতে অনুষ্ঠিত হল মিলনমেলা। এই উপলক্ষে ভাগীরথী পদ্মায় পুণ্যস্নানে ভক্তবৃন্দ শুচিস্নিগ্ধতায় উজ্জীবিত হয়ে পুতঃপবিত্র চিত্তে প্রিয়পরমের স্মৃতিতর্পণে আরোতর ঋদ্ধ-সমৃদ্ধ হলেন। দেওঘর গিয়ে হিমাইতপুরের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছিলেন–

'হিমাইতপুর সৎসঙ্গ আশ্রমকে পুণ্যক্ষেত্র বলে মনে হয়। ঐ জঙ্গলে বসে যে জিনিস গজিয়ে উঠেছিল তার মূল্য আমি নিজেও তখন ভাল করে বুঝে উঠতে পারনি। কিন্তু যে জিনিস ওখানে বসে পেলাম, তা থেকেই তো সব। কতবার কতভাবে ক'লাম, তবু শেষ হলো না, আর, হবেও না কোনদিন– যদিও বলি আমি একই কথা, যা আমি নিজের জীবন দিয়ে পেয়েছি। এ যে অফুরন্ত, তাই তো বলে অমৃত। ..... কত নাম, কত ধ্যান, কত তপ ওখানে হয়েছে– ওখান থেকেই evolve (গজিয়েছে) করেছে। যে মাটিতে এইসব হয়েছে সে মাটি সামান্য নয়, তা পৃথিবীর মহাতীর্থ।(আলোচনা প্রসঙ্গে–১৭শ খণ্ড)

প্রভুর দেওয়া মহাতীর্থক্ষেত্রের অভিধা ভক্তপ্রাণে অনন্তকাল সদা জাগ্রত থাকবে। আর তাই, ভক্তি-বিনম্র চিত্তে তাঁর কথা চরিত্রগত করে জীবন পথে চললে মনের সকল গ্রন্থির মোচনও হবে ওখানে(হিমাইতপুরে)। প্রভুর জয়জয়াকার হোক।

দিব্যবাণী
(বিধি-বিন্যাস)
–শ্রীশ্রীঠাকুর

দৈব
ভালই থাক্ আর মন্দই থাক্,
পুরুষকার তা'কে যেমন
পোষণ দেবে ও নিয়ন্ত্রণ ক'রবে
সক্রিয় অনুকূল্যে বা প্রতিকূলতায়,–
অবস্থাও তেমনতর হবে–
তা' ভালর দিকেই হো'ক
আর মন্দের দিকেই হো'ক । ২৬৬ ।

গুঁতোর ভিতর-দিয়েই সূতো মেলে–
যদি একার্থপরায়ণ তাকদ থাকে
শরীর ও মনে । ২৬৭ ।

প্রয়োজনীয় সেই তত বেশী
বহুর প্রয়োজনে যে যত । ২৬৮ ।

অসৎ-নিরোধী প্রবৃত্তি
সুচর্চ্চিত হ'লে
সম্বেগকে
বিক্রমেই পর্য্যবসিত ক'রে থাকে । ২৬৯ ।

ইহকালে তুমি যেমন চ'লবে,
যেমন ক'রবে–
সত্তায় অন্বিত ক'রে,
তা'ই-ই কিন্তু তোমার পরকালকে
নির্দ্ধারিত ক'রে তুলবে । ২৭০ ।

আমি যা'বলি
সে-বলাটা হয়তো
তোমার কাছে ভাল লাগতে না পারে,
উচ্ছৃঙ্খল সমালোচনায়
তা'কে হয়তো বিদীর্ণ ক'রে দিতে পার,
প্রবৃত্তি-নিবদ্ধ বিষাক্ত বাক্-চাতুর্য্য
তা'কে হয়তো তছ্‌নছ্ ক'রে দিতে পারে,–
কিন্তু প্রকৃতি তোমার
সে-প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলনে
রূপায়িত হ'য়ে সাড়া দেবেই কি দেবে,
সত্য যা'
জীবনীয় যা'
সম্বর্দ্ধনীয় যা'–
সত্তাই তা'র পূজার অঞ্জলি সংগ্রহ করে,
মানুষ
বোধিত নিয়ে
প্রবুদ্ধ হ'য়ে চ'লতে চায়–
আর, বিদ্যা সেখানেই । ২৭১ ।

প্রত্যয় যেখানে প্রাঞ্জল,–
প্রতিপাদনাও সেখানে
স্বতঃসন্দীপ্ত, উজ্জ্বল । ২৭২ ।

প্রত্যয় যেখানে যেমন বাস্তব–
সুকেন্দ্রিক সার্থক সঙ্গতিশালিনে,
প্রতিপাদন-দ্যুতিও সেখানে
তেমনই সহজ–
উপযোগী অর্থনার সৌষ্ঠব-বিনায়নায় । ২৭৩ ।

প্রত্যয় আছে,
নিষ্ঠা আছে,
বিশ্বাস আছে,
কিন্তু তদনুগ কৃতিদীপনা নাই,
আবেগ-উদ্যমী উপচয়ী অনুচর্য্যা নাই,
তা'র মানেই হ'চ্ছে–
প্রত্যয় সেখানে মূক,
বিশ্বাস সেখানে বধির,
নিষ্ঠা সেখানে খঞ্জ–
বাস্তবতায় । ২৭৪ ।

অবিশ্বস্ততায় অভ্যস্ত হ'য়ে উঠবে যতই,
জীবন ও প্রস্বস্তিকেও
হারাতে হবে ততই,
লোক-অনুকম্পা হ'তেও
বঞ্চিত হ'য়ে উঠবে তেমনি । ২৭৫ ।

যে বিশ্বস্ততা
বিশ্বাসঘাতকতায়
রূপায়িত হ'য়ে ওঠে

তা' আগাগোড়াই
উহারই ছদ্মবেশমাত্র। ২৭৬।

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ, ইষ্টনিবদ্ধ
বিশ্বস্তি যদি না থাকে–
সত্যের ভূমি চিরচঞ্চল সেখানে,
আর তা' ছন্ন, স্ববিরোধী
এবং বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রমযুক্ত,
তা' সত্তায় অসংস্থ ও অসঙ্গত,
তাই তা' সত্তাপোষণীও নয়কো;
রামপ্রসাদের গানের ঐ কথাই খাটে সেখানে–
মন তাঁতি তুই বুনতে গেলি তাঁত,
এসে প্রথমেই হারালি আঁত'। ২৭৭।

ঈশ্বর বিশ্বাস
ও আপূরয়মাণ প্রেরিত বা মহাপুরুষে
শ্রদ্ধা-অধ্যুষিত উর্জ্জী অনুরাগ
মানুষের ব্যক্তিত্বকে সংহত, সংস্থিত ক'রে
সুসঙ্গত বোধি-তৎপরতায়
কুশলকৌশলী
অদম্য সাহসী ক'রে তোলে;
কিন্তু প্রবৃত্তি-পরতন্ত্র-অভিভূত আবেগ
মানুষকে পরশ্রীকাতর, হিংসুক, দুর্ব্বল
ও ক্লীবমনা ক'রে তুলেই থাকে,
তাই, ত'াদের
সৎ-সন্দীপনী দুরাগ্রহ আবেগ
নিরন্তর অভিযানে
বিচ্ছুরিত হ'য়ে চলে না। ২৭৮।

সুনিষ্ঠাই স্বাতন্ত্র্যের স্রষ্টা। ২৭৯।

উৎসমুখতা যেখানে যত নিষ্প্রভ,
বিজ্ঞতার ছদ্মবেশে অজ্ঞতাও
তেমনি গহীন সেখানে। ২৮০।

চলনা যেখানে শুভ,
স্বস্তিও সেখানে সহজ। ২৮১।

প্রবণতা যা'র যেমন,
ত'ার চলন, আলোচনা।
ও দৃষ্টিভঙ্গীর ভিতর-দিয়ে
ফুটন্ত হ'য়ে চ'লতেও থাকে তা'–
তেমনই। ২৮২।

যা'র যা'তে সমর্থন ও সহানুভূতি–
বাস্তব সক্রিয়তায়,
অন্তঃকরণও তা'র তেমনি,
আবার, প্রবণতা যা'র যেমনতর,
ব্যক্তিত্বও তা'র তেমনই প্রায়শঃ। ২৮৩।

যা' যা'কে আপূরিত ক'রতে পারে না,
অর্থান্বিত ক'রতে পারে না–
সুযুক্ত বাস্তব-সঙ্গতিতে,
তা' তন্মুখী হ'লেও
ঐ 'সে' হ'তে সঙ্কীর্ণ। ২৮৪।

মানুষের মনোবৃত্তির
যা' পরিপোষক নয়–
সাধারণতঃ তা' পছন্দ করে না–
এমন-কি সত্তা-সম্বর্দ্ধনী হ'লেও। ২৮৫।

সুযুক্ত বাস্তব বিনায়ন না থাকলে
বোধ গজায় না,
আর, বোধ না গজালে
উপভোগও আসে না। ২৮৬।

বোধি যদি শ্রেয়ার্থপরায়ণ,
উপচয়ী, কর্ম্মঠ না হয়,
তা' প্রজ্ঞাকে অভ্যর্থনা ক'রতে পারে না। ২৮৭।

তৎপর ইন্দ্রিয়গ্রামের সাথে
সুসঙ্গত বোধি যত ক্ষিপ্রতর হ'য়ে ওঠে
একানুধ্যায়ী তাৎপর্য্য নিয়ে,–
উপস্থিত বা সহজ বুদ্ধিও
তত বেড়ে ওঠে। ২৮৮।

ভাবসম্পদ্ যা'ই থাকুক না কেন–
করায় ফুটন্ত ক'রে না তুললে
প্রকৃতিতে স্বতঃ হ'য়ে উঠবে না। ২৮৯।

নিবিষ্ট হ'য়ে কর–
বুঝ বাড়বে,
আর, সন্ধিৎসু চোখে দেখ–
বুঝবে ভাল। ২৯০।

যা'র বা যা'দের সাজসজ্জা, ধরণ-ধারণ
সাধারণে অনুকরণ ক'রে থাকে,
তা'ই দেখে বুঝতে পারা যায়–
মানুষের অন্তঃকরণ সেই দিকেই
আনতিপ্রবণ হ'য়ে উঠেছে। ২৯১।

প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া

(শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সহিত কথোপকথন)

সঙ্কলয়িতাঃ শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস; এম এ

(পূর্ব প্রকাশের পর)

১৫ই কার্তিক, বুধবার, ১৩৫২ (ইং ৩১/১০/১৯৪৫)

হেমন্তের সুন্দর, মধুর, উজ্জ্বল প্রভাত। জলে-স্থলে, আকাশে-বাতাসে, পল্লী-প্রকৃতির অন্তরে-বাহিরে নির্ম্মল প্রশান্তি। ছায়াচ্ছন্ন বাবালা গাছের তলায় এসে একখানি বেঞ্চিতে বসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর–মুখে তাঁর প্রসন্ন পরিতৃপ্তি, চোখে করুণাকোমল ললিতদৃষ্টি। ঈষৎ-আন্দোলিত বাবলা ডালের ফাঁক দিয়ে-দিয়ে তাঁকে ঘিরে চলেছে সোনার আলোর আনন্দ-নাচন। গতরাত্রের আলোচনায় আনন্দে উদ্ভাসিত হ'য়ে আছেন স্পেন্সারদা ও হাউজারম্যানদা। সেই নেশায় আজ আবার ছুটে এসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), যতীনদা (দাস) প্রভৃতিও এসে জুটেছেন। কথায়-বার্ত্তায়, আলাপে-আলোচনায় ধীরে-ধীরে আসর জমজমাট হয়ে উঠল। ক্রমেই লোকের ভিড় বাড়তে লাগল।

হাউজারম্যানদা জিজ্ঞাসা করলেন–কোন ছাত্রের বাড়ীর পরিবেশ যদি শিক্ষার অনুকূল না হয়, স্কুলের ভিতর-দিয়ে কি তার প্রতিকার করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর–সেটা পারা যায় শিক্ষকের তরফ থেকে ছাত্রদের ভিতর অনুরাগ ও দক্ষতার সঞ্চারণের ভিতর-দিয়ে। শিক্ষক দেখবে, কেমন ক'রে ছাত্রদের মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি, গুরুজনের প্রতি ভক্তি বাড়তে পারে। শিক্ষক প্রয়োজনমত অভিভাবকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবে।

'অর্জুনে পটু, সাশ্রয়ী কাজে
সুন্দরে সমাপন,
এই দেখে তুই বুঝবি লোকের
দক্ষতা কেমন।'

–এই হ'লো দক্ষতার মাপকাঠি। বাস্তব কাজের মধ্যে ফেলে এই অভ্যাস ও গুণগুলি ফুটিয়ে তুলতে হবে ছাত্রদের চরিত্রে। আমার মনে হয়, সাধারণ স্কুল করার চাইতে pauper reformatory school with arrangement for literacy (লেখা-পড়া শেখাবার ব্যবস্থাসহ দারিদ্রব্যাধি-নিরাকরণী বিদ্যালয়) যত বেশী হয়, ততই ভাল। সব দেশেই এর প্রয়োজন আছে। তথাকথিত শিক্ষা মানুষকে অক্ষম করে–তার প্রকৃতিপ্রদত্ত সদভ্যাস নষ্ট ক'রে দেয়। এতে সেবা দেওয়ার চাইতে প্রতারণার কলাকৌশল সে বেশী ক'রে শেখে, তার ব্যবহারের গোড়ায় হাত পড়ে না। ইংরাজী behaviour (ব্যবহার) কথার মানে হ'লো, be and have (হও এবং পাও)। অর্থাৎ যা' পেতে চাও, তদনুপাতিক যোগ্যতা অর্জ্জন কর, নিজের চরিত্রকে সেইভাবে নিয়ন্ত্রিত কর। pauper reformatory school (দারিদ্র্যব্যাধি– সংশোধনী বিদ্যালয়) ঠিক-ঠিক মত চালাতে পারলে যোগ্যতাহীন দাবী-দাওয়া বা পোষণহীন শোষণের বালাই থাকে না। টাকা থাকলে যে মানুষ pauper (দারিদ্র্য-ব্যাধিগ্রস্ত) হবে না, আর দরিদ্র হ'লেই যে সে pauper (দারিদ্র্যব্যাধিগ্রস্ত) হবে– তার কোন মানে নেই। pauper (দারিদ্র্যব্যাধিগ্রস্ত)-দের সাধারণতঃ করা ও দেওয়ার আবেগের চাইতে পাওয়ার আবেগ বেশী। কাজে আনন্দ পায় না, কাজে মন বসে না, সেবা করার সম্বেগ নেই, যাকে দিয়ে পায়, তাকে উচ্ছল করার বুদ্ধি নেই– কেবল পয়সার দিকে নজর। গরীবের মধ্যেও এ-রকম লোক আছে, ধনীর মধ্যেও এ-রকম লোক আছে। শিক্ষার ভিতর-দিয়ে তাদের মধ্যে করা ও দেওয়ার আবেগ ফুটাতে হয়, তাদের অভ্যাস-ব্যবহার এস্তেমাল ক'রে দিতে হয়। এতে উন্নতধরণের শিক্ষকই সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান প্রয়োজন। শিক্ষক জুটলে স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় যা'-কিছু এবং ছাত্র সংগ্রহের সমস্যা তাকে কেন্দ্র ক'রে সুবিন্যাস্ত সমাধান লাভ করবেই। pauper (দারিদ্র্যব্যাধিগ্রস্ত)- দের নিয়ে যে-সব শিক্ষক নাড়াচাড়া করবে, তারা নিজেরা যদি আদর্শে অটুটভাবে যুক্ত না হয়, তাদেরই মধ্যে দারিদ্র্যব্যাধি সংক্রামিত হবার ভয় থাকে কিন্তু। তাই অটুট আদর্শ অনুসরণে নিরত থেকে তাদের নিজেদেরকে হীনত্ব-অধ্যুষিত পরিপার্শ্বিকের প্রভাবমুক্ত রাখতে হবে।

হাউজারম্যানদা-স্কুলের বাইরে ছেলেদের দায়িত্ব কা'র উপর থাকবে। রাষ্ট্র কি সে দায়িত্ব গ্রহণ করবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর–তখন তাদের দায়িত্ব সমবেতভাবে ন্যস্ত থাকবে পরিবাব, পরিবেশ, শিক্ষাগার এবং রাষ্ট্রের উপর। শুধু আমার বাড়ীর ছেলেপেলেদের জন্যই যে শুধু আমি দায়ী, তো' নয়, আশেপাশের ছেলেপেলেদের ভালর জন্যও আমাকে সাধ্যমত দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। তার সঙ্গে আমার স্বার্থও জড়ান আছে। তারা যদি ভাল হয়, আমার বাড়ীর ছেলেপেলেদেরও

তাতে মানুষ ক'রে তোলার পক্ষে সুবিধা হয় । রাষ্ট্র দেশের মধ্যে এমন একটা উন্নত আবহাওয়া সৃষ্টি ক'রে তুলতে চেষ্টা করবে, যেখানে প্রত্যেকটি ছেলে সৎ হওয়ার প্রেরণা পায় । তা'ছাড়া সৎকে তারা পুরস্কৃত করবে, মর্য্যাদার আসন দেবে, অসৎকে কিছুতেই প্রশ্রয় দেবে না । রাষ্ট্রের কাছে যদি সতের সমাদর ও সম্মান থাকে, তাহ'লে প্রত্যেক সৎ হবার incentive (প্রেরণা) পায় । তাই, রাষ্ট্র ধর্ম্ম কৃষ্টিরও উপাসক হয়, সৎ ও সুধীজনের উৎসাহদাতা হয়, তাতে সকলেরই মঙ্গল ।

স্পেন্সারদা–স্কুলের আয়ব্যয় এবং পরিচালনা কিভাবে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর–Semi-government school (আধা-সরকারী স্কুল) হ'লে ভাল হয় । State ও public (রাষ্ট্র ও জনসাধারণ)-এর financial backing (আর্থিক সাহায্য) থাকবে, কিন্তু internal administration (আভ্যন্তরীণ পরিচালনা) teacher (শিক্ষক)-রাই করবেন । State (রাষ্ট্র)-এর উচিত goverment (সরকার)-এর সর্ব্বোচ্চ কর্মচারীদের চাইতেও শিক্ষকদের বেশী ক'রে মর্য্যাদা দেওয়া এবং শিক্ষকদের সহিত আচরণের এবং তাঁদের প্রতি ব্যবহারে সে শ্রদ্ধাভিনন্দার দেওয়া ভাব বাস্তবে দশজনের সামনে প্রকাশ্য ভাবে ফুটে ওঠা চাই । যেমন governor (রাজ্যপাল)-এর কাছে বা premier (প্রধানমন্ত্রী)-এর কাছে একজন teacher (শিক্ষক) গেলে তার তক্ষুণই দাড়িয়ে উঠে গভীর শ্রদ্ধায় তাকে অভ্যার্থনা করা উচিত (উঠে দাড়িয়ে চোখ বুজে হাত জোড় ক'রে রকমটা দেখালেন) । State (রাষ্ট্র) যদি শিক্ষককে এতখানি মান্য দেয়, তাঁকে গৌরব-গরীয়ান ক'রে দশজনের সামনে তুলে ধরে, তখন ছাত্রদেরও শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা,সমীহ, আনুগত্যের ভাব বেজায় বেড়ে যায় । শিক্ষককে এতখানি শ্রদ্ধা, মূল্য, মর্য্যাদা দিতে হবে, তার কারণ, তাঁরা হ'লেন কৃষ্টি, জীবন এবং আলোকের দেবদূত । ব্রাহ্মণরা হ'লেন normal teacher (স্বাভাবিক শিক্ষক), তাই তাঁদের এত সমাদর । শিক্ষক তথা ব্রাহ্মণকে অতিমান্য দেওয়া মানে–কৃষ্টি, জীবন এবং আলোককে জাতীয় জীবনে তার যথাযোগ্য গৌরবের আসনে আপ্রাণ আবাহনে সুপ্রতিষ্ঠিত করা ।

আমেরিকান সাহেবরা এতখানি শ্রদ্ধা ও আগ্রহ-সহকারে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনছেন দেখে গ্রামের অনেক লোক কৌতুহলী হ'য়ে ডিসপেসারীর পাশে এসে জড় হয়েছে । বালকদের মধ্যে এক-একজন সবার অলক্ষিতে অঙ্গুলি-নির্দেশ ক'রে কি যেন দেখাচ্ছে ।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথার সূত্র ধ'রে কেষ্টদা বললেন–শিক্ষকরা যদি তেমন হন, তবে রাষ্ট্র তাঁদের শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হবে । তাদের যোগ্যতার উপর সেটা নির্ভর করে । শ্রীশ্রীঠাকুর–Character (চরিত্র) থাকলেও State (রাষ্ট্র) যদি তা recognise (স্বীকার) না করে, তাহ'লে হয় না । Christ (যুশুখ্রীষ্ট)-এর কতখানি করা ছিল, কিন্তু State (রাষ্ট্র)-এর তা' ধরা ছিল না, অর্থাৎ State (রাষ্ট্র) recognise (স্বীকার) না ক'রে বরং উল্টো colour (রং) দিয়ে দিল, এতে state (রাষ্ট্র) এবং জনসাধারণ সবাই বঞ্চিত হ'ল । রাজশক্তি প্রবৃত্তিশাসিত হ'লে যে লোকের কী দুর্দ্দশা হয়, তা' ব'লে শেষ করা যায় না । মানুষের অস্তিত্ব নিরাপদ ও সুদৃঢ় হয়, রাজশক্তির সহায়তা ও সমর্থনে । তাই state (রাষ্ট্র) যা' recognise (স্বীকার করে, সাধারণ মানুষ তা' আয়ত্ত করার জন্য একটা আগ্রহ বোধ করে । ভাল মানুষদের তাই state (রাষ্ট্র)-এর যথোপযুক্ত সমাদর এবং সম্মান দেখান উচিত, তাদের সব রকম সুযোগ-সুবিধা দেওয়া উচিত । তাতে স্বার্থের খাতিরেও মানুষ ভাল হবার তাগিদে বোধ করে । দুঃখ কষ্ট, নিপীড়নকে উপেক্ষা ক'রে ভালকে আঁকড়ে ধ'রে থাকবে, তেমন লোকের সংখ্যা খুবই কম । যদিও ঐটেই নিষ্ঠার মানদণ্ড ।

স্পেন্সারদা–স্কুল এবং রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক কী থাকবে?

অনেক সময় তো দেখা যায়, রাষ্ট্রের সাহায্য নিতে গিয়ে রাষ্ট্রের তরফ থেকে অনেক অবাঞ্ছনীয় হস্তক্ষেপ হ'তে থাকে । শ্রীশ্রীঠাকুর–আভ্যন্তরীণ পরিচালনাভার থাকবে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের উপর–আর state (রাষ্ট্র) হ'ল পরামর্শদাতা । State-help (রাষ্ট্রের সাহায্য) নেবার দরুন সেখান থেকে যদি আদর্শ বিরোধী অবাঞ্চনীয় হস্তক্ষেপ হবার সম্ভাবনা থাকে, তবে জনসাধারণের কাছ থেকে জমিজমা এবং আর্থিক দান সংগ্রহ ক'রে স্কুলকে বরাবরের মত আত্মনির্ভরশীল ক'রে তুলতে হবে, যাতে state (রাষ্ট্র)-এর সাহায্যের প্রয়োজন না থাকে । শিক্ষকদের স্বাধীনতা থাকা চাই । শিক্ষা পরিচালনা বা পরিকল্পনা ব্যাপারে university-রও (বিশ্ববিদ্যালয়েরও) state (রাষ্ট্র)-এর মত আত্মকর্ত্তৃত্ব থাকা দরকার, state (রাষ্ট্র)-এর uncharitable whims and interference (অনুদার খেয়াল ও হস্তক্ষেপ) কখনও বরদাস্ত করা উচিত নয় । সমাজ ও শিক্ষামন্দিরের সাধু স্বাতন্ত্র্য যদি থাকে, তবে তাদের দিয়ে প্রয়োজনমত রাষ্ট্রযন্ত্রের সংশোধন করা যায়, কিন্তু সবই যদি রাষ্ট্রের পোঁ-ধরা ও কুক্ষিগত হ'য়ে যায়, তবে রাষ্ট্রের ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধন করবে কে? সেইজন্য ব্রাহ্মণরা কখনও রাষ্ট্রের মাইনের চাকর হ'ত না । মনে রাখতে হবে, মানুষের বাঁচা-বাড়ার জন্য রাষ্ট্র– বাঁচা-বাড়ার অপলাপী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার আধিপত্য মানবার জন্য মানুষ নয় । সেইজন্য রাষ্ট্রের

প্রধান কর্ত্তব্য হ'চ্ছে, প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী তাকে বাঁচা-বাড়ার পোষণ সরবরাহ করা।

স্পেন্সারদা–আজকাল দেখা যায়, প্রত্যেকটা রাষ্ট্র তার শিক্ষাব্যবস্থার ভিতর-দিয়ে তার-মত ক'রে একটা অসম্পূর্ণ রাজনৈতিক মতবাদ বা জীবনদর্শনকে অভ্রান্ত ব'লে চালিয়ে দিয়ে ছাত্রদের মধ্যে তদানুযায়ী একটা চিন্তাপ্রণালী ও ঝোঁক সৃষ্টি ক'রে ছেড়ে দিচ্ছে, এর-প্রতিকার কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর–শিক্ষার পিছনে যদি ধর্ম্ম না থাকে এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি না হয় ধর্ম্মকে পরিপূরণ করা, তবে এমনতর অস্বাভাবিক ঝোঁক তো গজিয়ে উঠবেই। ধর্ম্ম যদি চাই, সঙ্গে-সঙ্গে চাই আদর্শ–যাঁর মধ্যে ধর্ম্মের চেহারা দেখা যায়। আর এটাও ঠিক যে যে-রাজনীতি ধর্ম্মকে পরিপূরণ করে না, তা' কিছুই নয়। কারণ, ধর্ম্ম হ'লো তাই যা' আমাদের জীবন ও বৃদ্ধিকে সর্বতোভাবে ধ'রে রাখে।

হাউজারম্যানদা–কায়িক শাস্তিপ্রদান-সম্বন্ধে আপনার মত কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর পাশ ফিরে ব'সে বললেন–শিক্ষক এতখানি ভালবাসাময় অথচ গুরুগরীয়ান হবেন যে তিনি যদি ছাত্রের সঙ্গে একদিন কথা না বলেন, সেইটে তার কাছে কায়িক শাস্তির খাড়া হ'য়ে যাবে। কায়িক শাস্তি সেখানেই অনুমোদন করা চলে, যেখানে ছাত্রকে কোন অসংশোধনীয় বা অনুরণীয় আশু-পতনের হবে যে এই প্রয়োজনের আবির্ভাব যদি হয়, সেটাও শিক্ষকের পক্ষে পরম অগৌরবের। এর মধ্যে একটা ব্যাপার ঘটেছে, বলি। বড়খোকার একটি চাকর, সে মণখানেক ধান চুরি করেছে। তারপর বড়খোকা তার সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে আলাপ করাতে সে সব কথা স্বীকার করে। পরে সে অনুতপ্ত হ'য়ে বলে–"বাবু! আমার চুরি করাই অভ্যেস, চাকরী করলি হয়তো আবার চুরি করব, তাই আর আমি আপনার চাকরী করব না।" এই ব'লে সে বাড়ী চলে যায়, আর কাজ করতে আসে না। এর কয়েকদিন পর বড়-খোকা ১০/১৫ মণ ধান একটা গাড়ীতে ক'রে লোক দিয়ে তার বাড়ীতে পাঠায়ে দেয়। ধান দেখে ও জিজ্ঞাসা করে– 'কিসের ধান? কেন? তখন যা'রা ধান নিয়ে গিয়েছে তারা বড়খোকার নির্দেশ মত বলে– "বড়বাবু পাঠায়ছেন তোমার বৌ-ছাওয়াল-পাওয়ালের জন্যি। তোমার অপরাধের জন্যি তারা তো দায়ী না। তারা কেন কষ্ট পাবে? তুমি কাজ কর না, তারা খাবে কী? তাই বড়বাবু এই ধান পাঠায়ে দেছেন।" সে তখনই অনুতাপে মাটিতে ঠুস হ'য়ে পড়ল। বুকের জ্বালা জুড়োতে না পেরে গামছা কাঁধে ক'রে কোথায় যেন চ'লে গেল! সেখানে ক'দিন ছিল–কেবল কাঁদে–খায় না, কথা কয় না, কাঁদে। এখন এখানে এসেছে। বড়খোকা যতই ভাল ব্যবহার করে, ততই ও মরমে ম'রে যায়। কি করবে, ভেবে পায় না। সেদিন দেখলাম, শরীর একেবারে শুকায়ে গেছে। কত যেন অপরাধী, আমার দিকেও ভাল করে মুখ তুলে চাইতে পারে না। তাই মনে হয়–মনোবিজ্ঞানসম্মত ভালবাসাময় ব্যবহারে মানুষের complex-এর core (বৃত্তির মর্ম্মদেশ) একবার penetrate (ভেদ) করতে পারলে তবেই মানুষ গলে, মানুষ বদলায়।

স্পেন্সারদা–রাষ্ট্র এবং পিতামাতারও তো কায়িক শাস্তিদান-সম্বন্ধে ঐ মনোভাব হওয়া উচিত?

শ্রীশ্রীঠাকুর–পারিবারিক ব্যাপারে তো ঐ রকমই, তবে আমার মনে হয়, state (রাষ্ট্র)-এর শাস্তিবিধান এমন হওয়া উচিত যে যদি কেউ গুরুতর অপরাধ করে, তবে তার বিচারের পর তাকে ক্ষমা করার প্রাথমিক অধিকার হবে–যার প্রতি সে অন্যায় করেছে সেই ব্যক্তি নিজে। অবশ্য অভিযোক্তা ক্ষমা করলেই যে রাষ্ট্র সবক্ষেত্রে ক্ষমা করতে পারবে, তা' নয়। কারণ, এমন সমস্ত ব্যাপার থাকতে পারে, যেখানে অন্যায়-কারীকে ক্ষমা করা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের পক্ষে বিপজ্জনক। সেখানে অভিযোক্তা ক্ষমা করলেও রাষ্ট্রের পক্ষে তা' করা সমীচীন হবে না। সে-সমস্ত ক্ষেত্রে ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে কঠোর দণ্ডাজ্ঞার পরও যদি বিক্ষুব্ধ, অত্যাচারিত, ক্ষতিগ্রস্ত যে, তার ক্ষমাদানই state (রাষ্ট্র)-কর্ত্তৃক বহাল থাকে, তবে অনেক কিছু সুফল ফলার সম্ভাবনা আছে। তার মার্জ্জনা পেতে গেলে তখন দোষীকে তাকে খুশি করতে হবে, তৃপ্তি দিতে হবে–আপ্রাণ প্রচেষ্টায় তার প্রাণ স্পর্শ ক'রে। তার বুকের ক্ষত মুছে দিয়ে তাকে নিজের প্রতি অনুকল্পপরায়ণ ও মমতা-আনত ক'রে তুলতে হবে। প্রাণের দায়ে এই কঠিন সাধনায় ব্রতী হ'তে গিয়ে তার মধ্যে destructive habit (ধ্বংসাত্মক অভ্যাস)-এর বদলে benign constructeve habit (কল্যাণকর সংগঠনমূলক অভ্যাস)-এর সৃষ্টি হবে। সে শুধরে উঠবে ভিতর-থেকে। উভয়ের মধ্যে তিক্ত বিজাতীয় সম্পর্কের পরিবর্ত্তে প্রীতিমধুর সম্পর্ক গ'ড়ে উঠবে। পরস্পরের মধ্যে এমন হ'তে হ'তে সারা দেশময় একটা শান্তিময়, সুখকর আবহাওয়া উথলে উঠবে। এই কৌশলের বিহিত ও সুচারু প্রয়োগ ও প্রসারে সারা জগতে শান্তি-প্রতিষ্ঠার পথ অনেকখানি পরিষ্কার হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর শান্তি কথার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দেখতে বললেন। চুনীদা (রায়চৌধুরী) দেখে এসে বললেন–শান্তি এসেছে শম্-ধাতু থেকে। শম্-ধাতু মানে দর্শন, শ্রবণ, উপশম, আলোচনা।

শ্রীশ্রীঠাকুর–অপরাধীর দোষ এবং যার প্রতি অপরাধ করা

ইষ্টস্থান ও ইষ্টভৃতি নিয়ে ক'টি কথা

ড. শ্রীরবীন্দ্রনাথ সরকার

হয়েছে তার ক্ষতি ও বেদনার উপশম যখন হয়, তখনই শান্তির মলয় হাওয়া বইতে থাকে ।

সে দিনটি ছিল ৩০ কার্ত্তিক ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ । ১৬ নভেম্বর ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ । পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র তখন তাঁর পুণ্য জন্মভূমি পরমতীর্থ হিমাইতপুরধামে । সম্মুখে পদ্মার বাঁধ । উন্মুক্ত অঙ্গনে ছোট ছোট কটেজ । সেই সব কটেজে এখানে ওখানে শ্রীশ্রীঠাকুর নানা সময়ে বসেন । পেছনে মাতৃমন্দির । ওটি শ্রীশ্রীমায়ের বাসভবন । ভক্তরা ওকে শ্রীশ্রীমাতৃমন্দিরই বলে থাকেন । ওরই পশ্চিমে(সে সময়ের) ফিলানথ্রপী ভবন । পেছন দিয়ে উপরে উঠার সিঁড়ি ঘর(সেটি এখন দরজা জানালা বিহীন ভগ্নপ্রায় ঘর) । ওর উত্তরে একটি পাকা ঘর । দেখতে চারচালা । ওটিই ডাকঘর । ডাকঘর আর ফিলানথ্রপীর পশ্চিমে একটি খোলামেলা জায়গা । ওখানেই সকালে বিকালে বাজার বসত । সব ধরনের শাক-সবজি, তরি তরকারী, দুধ ইত্যাদি ওখানে মিলত । বাঁধ যেখানে শেষ হয়েছে তার দক্ষিণে উন্মুক্ত দিগন্ত । বর্ষার উছল পদ্মার জলরাশি ওখানে ঢেউ খেলত ছলাত্ ছলাত্ শব্দে । মাতৃমন্দিরের পূর্বপ্রান্তে একতলা ভবনটি ছিল বড়মার রান্নাঘর । ওর দক্ষিণে এবং পুবে বেশ কিছু বকুল গাছে মৌসুমে ফুল ফুটতো, ফুল ঝড়তো । হয়তোবা প্রভুর উন্মুক্ত অঙ্গনকে তারা নীরবে জানাতো প্রণাম । মাতৃমন্দির ছোঁয়া বকুল গাছগুলোর পাশেই একটি ছোট্ট মন্দির । স্মৃতি মন্দির । এটি শ্রীশ্রীঠাকুর নিজহাতে নির্মাণ করিয়েছিলেন । মন্দিরের পাঁচটি চূড়া । একটি বড় চারটি ছোট । প্রত্যেকটি চূড়ায় একটি করে লোহার শলাকা আছে । উত্তরাংশে মাঝখানে একটি বড় আসন । এখানেই প্রতিষ্ঠিত ছিল জননী মনোমোহিনী দেবীর গুরুদেব হুজুর মহাজের প্রতিকৃতি । উপরেও চারটি প্রতিকৃতি । স্বামীজি মহারাজ, মহারাজ সাহেব ও সরকার সাহেব । ওরই দক্ষিণে একটি একতলা বাড়ি । তার নাম নিভৃত নিকেতন । পূর্বাংশে দুটি ঘর, শৌচাগার । পূর্বে ও পশ্চিমে একাধিক উন্মুক্ত দরজা । পশ্চিমে আরও একটি ছোট ঘর । এই নিভৃত নিকেতনটি শেষদিকে(১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের আগে) নির্মাণ হয় । ঘরটিতে শ্রীশ্রীঠাকুর পা রেখেছিলেন । এখানেই ছিল অতীতের লতাকুঞ্জ ঘেরা নিভৃত নিকেতন ।

সেদিনের ৩০শে কার্ত্তিকের কথা বলতে গিয়ে যে দালিলিক গ্রন্থটিকে আমরা সামনে রেখেছি সেটি হল আলোচনা প্রসঙ্গে । শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সহিত কথোপকথন । সংকলয়িতা শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস এম এ । লেখা শুরু হয়েছিল ৩২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে । ১৫ আগস্ট ১৩৩৯ খ্রিস্টাব্দ । প্রফুলদা শুরুতে লিখেছেন ।– ইদানীং প্রচণ্ড গড়ম পরছে– দুপুরের দিকের আশ্রম সংলগ্ন চরের বালু তেতে আশ্রমের সামনের দিকের আবহাওয়াটা অগ্নিময় করে তোলে– বেলা পড়ে আসলে অবস্থাটা ধীরে ধীরে সহনীয় হয়ে ওঠে ।

৩০শে কার্তিকের আগের দিনটি ছিল ২৯ কার্তিক বুধবার । এদিনের পরিমণ্ডলটিকে বর্ণনা করছেন । আলোচনা প্রসঙ্গের সংকলয়িতা মহোদয় নিম্নোক্তভাবে । স্থান-পাবনা সৎসঙ্গ আশ্রম । শ্রীশ্রীঠাকুর আশ্রিত স্থানীয় একজন প্রবৃত্তিতাড়িত হয়ে স্বধর্ম ও কৃষ্টিত্যাগ করে ধর্মান্তর গ্রহণ করবে বলে স্থির করেছে । এই সংবাদ পেয়ে তিনি(শ্রীশ্রীঠাকুর) দারুণ মর্মাহত হয়ে পড়েছেন । দুপুরে খেতে গিয়ে ভাতের থালায় হাত দিয়ে উঠে এসসেছেন । খেতে পারেননি, ঘুমুতেও পারেননি । লোকটিকে ডাকিয়ে তার সঙ্গে নিরালায় কথাবার্তা বলছেন, বোঝাচ্ছেন–পূরয়মান ইষ্ট, কৃষ্টি, বৈশিষ্ট্য ও পিতৃপুরুষকে অস্বীকার করে যে ধর্মান্তর গ্রহণ তা কতখানি সত্ত্বা সম্বর্ধনার অর্থাৎ ধর্মের বিরোধী । কারণ অমন যাঁকে গ্রহণ করা হয়, তার ভিতর, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধোচ্ছল আগ্রহ তো থাকেই না বরং ধর্মের নাম ভাঁড়িয়ে নিজের অপকর্মকে সমর্থন করার প্রবৃত্তি প্রলুব্ধ প্রেরণাই থাকে প্রবল । তাতে করে তাঁকে এবং প্রত্যেকটি প্রেরিতকেই অবমাননা করা হয় । লোকটি বুঝেও বুঝছে না, তাই তাঁর(শ্রীশ্রীঠাকুরের) মন বড় বিমর্ষ । চোখের দিকে চাওয়া যাচ্ছে না ।

পরদিনই ৩০ কার্তিক । সত্যদা(দে) বলছিলেন– কলকাতার এক ভদ্রলোক শ্রীশ্রীঠাকুরের নল কেনা উপলক্ষে অনেককে ফাঁকি দিয়ে তাদের ইষ্টভৃতির টাকা নিয়ে নিয়েছে ।

শ্রীশ্রীঠাকুর– অমন দেয় কেন? যারা দেয় তাদেরই তো দোষ । বিশ্বাস রাখা ভাল কিন্তু বেকুব হওয়া ঠিক নয় । আর ইষ্টভৃতির টাকা যে কোথায় পাঠাতে হবে আমি তো স্পষ্ট করে লিখে দিয়েছি । অপরের উল্টো কথা মেনে নেয় কেন? একথা সবার জানা উচিৎ যে, আলো জ্বললে সেখানে যেমন পোঁকা আসে তেমনি টিকটিকিও আসে ।(আলোচনা প্রসঙ্গে-১ম সংস্করণ পৃষ্ঠা ৫০)

আমরা মনে রেখেছি যে, আলোচনা প্রসঙ্গে'এর গ্রন্থাকারে

প্রথম প্রকাশ ১০ ফাল্গুন ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ । সৎসঙ্গ(দেওঘর) । আমরা বুঝতে পারি পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণেই গ্রন্থাকারে এর প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রায় আঠারো বছর সময় লেগেছে । এর ভূমিকা লেখক ও সংকলক মূলত: অভিন্ন ব্যক্তি । ভক্ত জনের চোখে তিনি এক অবিস্মরণীয় ও ব্যাসপ্রতীম ব্যক্তিত্ব । এই গ্রন্থ প্রকাশনার প্রাক্ কথা হিসেবে নিবেদনে লিখেছেন– "আশ্রমে এসে স্থায়ীভাবে যোগদান করি ১৯৩৯ সালের ৭ই মে । আশ্রমে আসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন কেষ্টদার সাথে থেকে তাঁর নির্দেশমত কাজ-কর্ম করতে । এমন সময় পূজ্যপাদ কেষ্টদা একদিন বললেন, প্রফুল্ল! শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে গিয়ে রোজ যা দেখ, শোন– লিখে রেখো, পরে এটা বিশেষ কাজে লাগবে ।" সেই থেকে ঋত্বিকাচার্যের সে নির্দেশ যথাসম্ভব পালন করতে চেষ্টা করছি, এতে উপকৃত হচ্ছি আমি নিজে । বলা-বাহুল্য, প্রথমে সব কথা অবিকল টুকতে পারিনি– স্থান কাল পরিবেশ শ্রীশ্রীঠাকুরের অনিন্দ্য সুন্দর লীলায়িত আকার ঈঙ্গিত, ভাব-ভঙ্গি, চাউনি-চলন, রকম-সকম, ভাব-ব্যঞ্জনা ইত্যাদি প্রতি মুহূর্তে যে মানুষের জীবনে ও চেতনায় কি অঘটন ঘটায়, কি গুঢ় পরিবর্তন আনে, কি অমোঘ প্রভাব বিস্তার করে তারও আলোচ্য ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয়নি আমার পক্ষে ।

এই গ্রন্থের সর্বশেষ প্রকাশনায় প্রকাশক: শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সৎসঙ্গ পাবিশিং হাউস, পোস্ট-সৎসঙ্গ, দেওঘর, বিহার । সপ্তম সংস্করণ ১৪০১ বঙ্গাব্দে । এই গ্রন্থে উলিখিত বিষয়ে একটি বাক্যর পূর্বে সংযুক্ত । "একথা মনে রেখো যে, ইষ্টার্ঘ্য আমার বরাবর অর্থাৎ সৎসঙ্গের ফিলানথ্রপি অফিসেই পাঠাতে হবে" । আলোচনা প্রসঙ্গে , ৭ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৩৭ । লক্ষণীয় যে এখানে একটি বাক্য সংযুক্ত হয়েছে এই বাক্যটি প্রথম সংস্করণে ছিল না । সপ্তমে তা সংযুক্ত হলো কেন? তা প্রকাশক মহোদয় উল্লেখ করেননি । সেক্ষেত্রে এই সংযোজনটির গুরুত্ব ভিন্নভাবে বিবেচ্য ।

সৎসঙ্গের ইতিহাস কথা অনুশীলন ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি যে দেওঘর ধামেই প্রকাশিত পূর্ববর্ত্তী গ্রন্থসমূহ সৎসঙ্গ পাবলিসিং হাউস এর লোগোতে(মনোগ্রাম) লেখা হতো 'সৎসঙ্গ', পাবনা । কবে কখন কেন পাবনা এই শব্দটি বর্জিত হয়েছে তার কারণ আমাদের জানা নেই । এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের যে বাক্যটি সংযুক্ত হয়েছে সেটির বক্তব্য কি এই যে ইষ্টার্ঘ্য সৎসঙ্গ ফিলানথ্রপি অফিসেই অর্থাৎ দেওঘর ফিলানথ্রপি অফিসেই পাঠাতে হবে । আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণের যে বাক্যটি ছিল না ৭ম সংস্করণের (১৪০১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত) যুক্ত বাক্যটি আদৌ গ্রহণযোগ্য হতে পারে কি ? দেওঘর ধামেই এখন তিনটি ফিলানথ্রপী বিদ্যমান । এই তিনটির মধ্যে যে কোনটিতেই ইষ্টভৃতি পাঠানো বৈধ বলে বিবেচ্য ?

প্রেমময়ের পুণ্য বাণী –

"ইষ্টভৃতি ইষ্টকেই দিস
অন্যকে তা দিসনা
অন্যকে তা দিলেই জানিস
আসবে বিপাক গঞ্জনা ।"

ইষ্টভৃতি মাসান্তে কোথায় পাঠাতে হবে ? শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন–

"মাসটি যবে শেষ হবে, তুই
ইষ্টস্থানে পাঠাস তা ।"

ইষ্টস্থান কি? যেখানে অবস্থান করে আমরা মঙ্গল অভিগমনে চলতে পারি সেই ক্ষেত্রে গোটা পৃথিবীই আমাদের কাছে ইষ্টস্থান হতে পারে । প্রভু যেদিন ইষ্টভৃতি প্রেরণ প্রসঙ্গে বাণী উচ্চারণ করেছিলেন সেটি পরমতীর্থ হিমাইতপুরধামে বসেই উচ্চারণ করেছিলেন । তাই এই পুণ্য ধামেই সকলের "ইষ্টতীর্থ" বা "ইষ্টস্থান" ।–

"ঐ তিনি যখন যেখানে আবির্ভূত হন সে স্থানই মানুষের পরমতীর্থ" । পুণ্যভূমি হিমাইতপুর ধামই মানুষের চিরকালের "ইষ্টতীর্থ" "পরমতীর্থ" ।

সনাতনী ধর্মক্ষেত্রে – জীবনক্ষেত্রে ভারতভূমির বিভাজন তথা বাংলার বিভাজন শ্রীশ্রীঠাকুরের অনভিপ্রেত হলেও তখন তা ঠেকানো যায়নি । তারপরও প্রভু বলেছিলেন "বাংলা জাগলে জগত জাগবে " । বিভাজিত বাংলার মাটিতে তাঁর পুনঃজাগরণের আকাঙ্ক্ষা তিনিই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছিলেন । স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে নানা সংকটের মধ্যেও পরমতীর্থ হিমাইতপুর ভূমিতে পুনঃজাগরণ এক মহাবিস্ময় । ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ নামের তিনটা রাষ্ট্র বিদ্যমান । তারপরও হিন্দু মুসলিম মিলনের বন্ধন এখানে অটুট । পবিত্র মসজিদের আযানের ধ্বনি আর পুণ্য মন্দিরের আহ্বানী মানবিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে সামান্য সংকট সৃষ্টি করেনি । বরং প্রেম-চেতনায় মিলন ভূমিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে । প্রভুর কৃপায় হিমাইতপুর এখন সার্বজনীন তীর্থক্ষেত্রের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত । তাই 'ইষ্টস্থান' তথা ইষ্টভৃতি প্রেরণেরও যথার্থ স্থান এই পরমতীর্থ হিমাইতপুর ধাম । তবে রাষ্ট্রীয় আইন কানুন বিধি নিষেধের আওতায় থেকে আইনি প্রক্রিয়ায় কেবল ইষ্টার্ঘ্য ইষ্টস্থানে প্রেরণ ও গ্রহণ কার্যক্রম সচল থাকবে -এই মুহূর্তে এটাই কাম্য । জয়গুরু, বন্দেপুরুষোত্তমম্ ।

ওস্যান ইন এ টি কাপ

(বিন্দুতে সিন্ধু)

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের জীবনকাহিনী

রে, এ হাউজারম্যান (জুনিয়র) অনুবাদ-শ্রীমতি ছবি গোস্বামী

(পূর্ব প্রকাশের পর)

৩৩

একদিন বিকালে আমরা কয়েকজন বড়াল-বাংলোর বারান্দায় ঠাকুরের কাছে বসে আছি। হঠাৎ দেখলাম যে, একটি ল্যাণ্ডরোভার গাড়ী এসে থামলো। একটা কলার ছাড়া সাদা শার্ট, ধুতি আর সাধারণ চটি পরে, মোরামের বাঁকানো পথে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছেন একজন মানুষ। আমাদের দিকে অত্যন্ত সাধারণ ভঙ্গীতে এগিয়ে আসা এই মানুষটি কিন্তু কোন সময়েই তাঁর নিজের গুণ মর্য্যাদা কিছুই জাহির করেন না। আর, এই মানুষটির দিকে তাকিয়েও কেউই কিন্তু বুঝতে পারবেন না যে, ইনি রাজ্যসভার এক সম্মানীয় মর্য্যাদাপূর্ণ সদস্য। যিনি কিনা এই অঞ্চলের একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় রাজনীতিবিদ্। আর কিছুদিনের মধ্যেই যিনি এই রাজ্যেরই মুখ্যমন্ত্রীর আসন অলংকৃত করবেন। পণ্ডিত বিনোদানন্দ ঝাঁ।

ঠাকুর খুব তাড়াতাড়ি একজন ভক্তকে তাঁর প্রাথমিক আহার্য্যের আপ্যায়নের নির্দেশ দিয়েই, রাজ্য শাসনে দক্ষ পরিশীলিত মানুষটিকে প্রীতি শুভেচ্ছা সম্ভাষণে আহ্বানের জন্য উঠে সিঁড়ি দিয়ে নীচে মোরামের পথে নামলেন। পণ্ডিত ঝাঁ ছিলেন জনসাধারণের কাছের মানুষ। তিনি তাঁর সক্রিয় সহানুভূতির মনোযোগে লক্ষ্য করেছেন আমাদের সামগ্রিক সক্রিয় নিষ্ঠানন্দিত উন্নয়নকে। ফলে, আমরা দেওঘরে আসার খুব অল্প কিছুদিনের ভিতরেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের পরে আমরা আমাদের কাজের পরিকল্পনার সমস্ত রূপরেখার একটা আনুপূর্বিক বর্ণনা দেওয়াতে, বেশ আনন্দময় একটা বিকালকে যেন আমরা অনুভব করলাম।

সেই বিকালের শেষবেলায় পণ্ডিত ঝাঁ, ঠাকুরকে তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধা জানিয়ে বললেন,– "আপনি কতো স্বচ্ছন্দে কেমন একটা অলৌকিক কাজ করেছেন। আমি তো আজ এক সপ্তাহ ধরে কাজ করছি, কিন্তু কোথাও আপনার মতো এর ছোট্ট একটা কণাও পারছি না ঠাকুর।"

"তা আপনার অসুবিধা হচ্ছে কনে?"

"টাকা।" তিনি হাসতে হাসতে রহস্য করে বলেই আবার মুহূর্তের মধ্যে তার বলা কথাটাকেই তিনি সংশোধন করে বললেন,- "টাকা নিজে নয়। কিন্তু এই যাদের আছে, সেই মানুষ।" শিক্ষার জন্য আমরা যে পরিমাণ টাকা তুলতে পারবো, সরকারের মত আছে যে, সেই পরিমাণ টাকাও সরকার দেবে। নানারকমের সব সুযোগ সুবিধা যা যা আছে এখন, সেসব ব্যবহার করে, আমরা একশো হাজার টাকায় এখুনি একটা বিজ্ঞান কলেজ করতে পারি। দেওঘরের জনসংখ্যাও তো এখন প্রায় একশো হাজারেরও উপর। কিন্তু এটা খুবই লজ্জার ব্যাপার যে আমাদের এখানকার ছেলেদের উচ্চ শিক্ষালাভের কোন সুযোগই নেই। আর ভারতের এখন প্রয়োজন হলো বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রাপ্ত মানুষের। এখন যেহেতু আমরা স্বাধীন, সেইজন্য অনেক কিছুই তো আমাদের করার আছে। তবুও আমরা সারাদিনই দেশের ধনী মানুষদের দেখে দিন কাটাচ্ছি। যেহেতু দেশের ধনী মানুষেরা তাদের নিজেদের ছেলেদের উচ্চ শিক্ষার জন্য কলকাতায় বা ভারতের অন্যান্য শহরে, অথবা বিদেশেও পাঠাতে পারছেন, ফলে, তাদের আর নিজেদের জন্য এই বিজ্ঞান কলেজের কোন প্রয়োজন তারা আর তেমনভাবে অনুভব করছেন না। ফলে, আমাদের এখানে অন্যান্য ছেলেদের উচ্চ শিক্ষার জন্য নানারকমের সর্পিল যুক্তির ছায়াতে যা লাভ হচ্ছে, তা হলো ভবিষ্যতের জন্য দুর্ভোগ। এটা শুধু টাকার সমস্যা নয় ঠাকুর, মানসিকতার। এর ফলে একটা অর্থগৃধ্নু মানসিকতার সৃষ্টি হচ্ছে ক্রমশই। কেন ঠিক জানি না যে, এখানকার সব মানুষের আর ছেলেদের উন্নয়নের কথাতে তারা সকলেই কেমন যেন ভয় পেয়ে যায়, যা কিনা অনেকটাই মৃত্যুভয়ের মতোই।

অনেক্ষণ কথা বলে থামলেন পণ্ডিত ঝাঁ। সামনে ঠাকুরকে, সৎসঙ্গের চারপাশে, কাছে দূরে দাঁড়ানো বসে থাকা সব মানুষজন, একটু একটু করে আশ্রম পরিমণ্ডলে উন্নয়নের চিহ্ন, -এসব তিনি যেন একবার চোখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখলেন। আবার তিনি লম্বা শ্বাস নিয়ে বলতে শুরু করলেন ঠাকুরকে,– "ঠাকুর! অনেক বিশিষ্ট ধনী মানুষের মনের ভিতরের একটা অন্তর্নিহিত চাপা ভাব যেন, এইসব সাধারণ মানুষের শিক্ষালাভ, দেশে অনেক অমঙ্গলকর সমস্যার সৃষ্টি করতে

পারে । অবশ্য দেশের প্রশাসনের বিশিষ্ট পদাধিকারী ব্যক্তিরা এমন ভাবেন না । এরকম তারাই ভাবেন, যারা মানসিকভাবে অনেকখানি হীনমন্য আর সংকীর্ণ । কাজেই সেসব মানুষের কাছে কোন সাহায্য পাওয়ার আসা করাই বৃথা ।" কথাগুলো বলে একটা অপরাধমূলক বিষণ্ন হাসিতে তিনি ওঠার জন্য প্রস্তুতি নিতে নিতে আবার জানালেন,- "আপনি এত অল্প সময়ের মধ্যে এখানে যা অলৌকিক কাণ্ড সৃষ্টি করে এগিয়ে চলেছেন, যে ভার আর চাপ ইতিমধ্যেই আপনি নিয়েছেন, সেখানে আমি আমার কোন সমস্যার বোঝা আপনার মাথাতে দিতে চাই না ।"

ঐ দিনই সন্ধ্যেবেলায় যখন আমরা সকলে সমবেতভাবে বসার জন্য ব্যবস্থা করছি, তখনই ঠাকুর হঠাৎ করে, ঠাকুরের প্রণামদক্ষিণার হিসাব রাখেন ননীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন,- "এ্যাই ননী, টক করে ক' তো, পাঁচ হাজারের মধ্যে ছয় করে কতো হয়?"

ননী সঙ্গে সঙ্গে মাটীতে পড়ে থাকা একটা পাথর দিয়ে, মাটীতেই হিসাব করে জানালো,- "ঠাকুর! আটশো তেত্রিশ ।" ঠাকুর শুনেই সামনে সকলকেই ছ' টাকা করে দিবের পারে? তাহলেই কিন্তু এখানকার সব প্রতিভাওয়ালা ছাওয়ালরা একখান বিজ্ঞান কলেজ প্যাবের পারে ।" সন্ধ্যা শেষের আগেই, ঠাকুরের এই ইচ্ছা যেন ঢেউয়ের মতোই সুদুর সৎসঙ্গে সর্বত্র অত্যন্ত দ্রুত ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা হলো । সারা দেশের ঋত্বিকগণ নির্দিষ্ট আংশিক অর্থের নির্দেশের চিঠি পেয়ে গেলেন, কী উদ্দেশ্যে এই অর্থ আহরণ করা হচ্ছে সব কিছু জেনে । এই আর্থিক তহবিল গঠনের জন্য দ্রুত সর্বত্র সভা সংগঠিত হতে লাগলো ।

মেদিনীপুরের যজ্ঞেশ্বর সামন্ত তার স্কুলের বাগানে চেয়ারের উপরে ঠাকুরের ছবি বসিয়ে সকলকে ডেকে সমবেত প্রার্থনা সভার আয়োজন করলো । এই সংবাদ জেনেই প্রায় শ' দেড়েক লোক সমবেত হলো । প্রার্থনা, সমবেত কয়েকটা ভক্তিমূলক সঙ্গীতের পরেই যজ্ঞেশ্বর সকলকে পড়ে শোনালেন উঠে দাঁড়িয়ে, সৎসঙ্গ থেকে পাওয়া চিঠিটা । সঙ্গে সঙ্গে নারী পুরুষ, এমনকি বেশ কিছু শিশু যুবকও একের পর এক ছ'টাকা দিতে তাদের সম্মতি জানাতে থাকলো ।

যে কোন কারণেই হোক না কেন, একমাত্র সুদ ব্যবসায়ী হরিবন গৌরওয়ালা কিন্তু উঠলোও না, আর তার কোন সম্মতির কথাও কিছু জানালো না । কিছুদিন হলো সে দীক্ষা নিয়েছে । কয়েক মাস আগে তার বিবাহিত মেয়ের প্রথম সন্তানের জন্ম দিতে গিয়েই সংকটে বিপদাপন্ন হয়ে পড়ে । পারিবারিক গৃহ চিকিৎসক তো সম্পূর্ণভাবে আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন । হরিবণের বন্ধকী কারবার আর যজ্ঞেশ্বরের মুদি দোকান একই বাড়ীতে । তাই, সব জেনে যজ্ঞেশ্বর তাড়াতাড়ি সব জানিয়ে ঠাকুরের কাছে লিখে পাঠালেন । আর সেই অসুস্থ মেয়ের পাশে অনবরত তাকে ছুঁয়ে নাম চালাতে থাকলো । মেয়ের সম্পূর্ণ সুস্থতার পরেই হরিবন দীক্ষা প্রার্থী হয়েছিলো । অত্যন্ত কৃপণ স্বভাবের হরিবনের পক্ষে প্রত্যেকদিন যে ভালোবাসার প্রীতি অর্ঘ্য অবদান ইষ্টভৃতি– সেটা দেওয়াও যথেষ্ট কষ্টের ছিলো । তবুও সে প্রতিদিন কুড়ি পয়সা ইষ্টভৃতি করেও মনে মনে ভাবতো যে এটাই অনেক বেশী হয়ে যাচ্ছে ।

সেই হরিবন জোরে জিজ্ঞাসা করলো,– "আচ্ছা যখনই এমন টাকার কোন প্রয়োজন হয়, তখনই ঠাকুর কেন অলৌকিকত্ব দেখাতে পারেন না?" তার প্রশ্ন শুনে যজ্ঞেশ্বর তার দিকে বেশ কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে তাকে বললো,-" তোমার কি মনে আছে, দশ বছর আগে তোমার বাড়ীতে ডাকাতি হয়েছিল । আমার মনে হয়, তোমার ডাকাতি হয়েছিল মোট আট হাজার ষাট টাকা ।"

"কি বলছো কী! ওটা আবার জীবনে কেউ ভোলে নাকি? কেউ ভোলে নাকি? একটা মানুষের কাছে কি এটা ভুলে যাওয়ার মতো ঘটনা?"

"বেশ! তাহলে শোন, আজকে বলছি, আমিই সেই মানুষ, যে তোমার বাড়ীর ডাকাতিতে সেদিন সাহয্য করেছিলাম ।" যজ্ঞেশ্বরের কথা শুনে হরিবন উঠে দাঁড়ালো সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু তার যেন সব কথাই কেমন কোথায় হারিয়ে গেলো । সেই টাকা! যা ডাকাতি হয়েছিলো, কৃপণ মনে সে স্মৃতি উথলে উঠলে মুহূর্তেই । টাকার স্মৃতি আর শোকে হরিবণের দু'চোখ যেন ধীরে ধীরে কেমন রক্তাক্ত হলো । দ্রুত শ্বাস চলতে লাগলো শরীরে । একভাবে যজ্ঞেশ্বর দিকে, তার হয়তো এই মুহূর্তে অনেক কিছু করার ইচ্ছে থাকলেও, শেষে কোন কিছুই করতে না পেরে শুধু বলে উঠলো,–"তুমি–তুমি– তুমি একটা চোর?"

দুজনেই দুজনের দিকে বেশ কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো । হরিবন থর থর করে কাঁপছিলো । তারপর সে তার চোখের পাতা বন্ধ, করলো, কী ভাবলো কে জানে । তারপর নরম হয়ে সে তার নিজের জায়গাতে বসে, হাতটা তুলে সামনের দিকে বাড়িয়ে বললো,– " বেশ! অতীতকে যেতে দাও । তুমি আমার মেয়েকে বাঁচিয়ে দিয়েছ । তোমার উপর আজ আর আমি কোন অভিযোগ চাপাচ্ছি না । কারণ, মেয়ের

জন্যই আমি তোমার কাছে ঋণী, কৃতজ্ঞ ।" তার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞেশ্বর তাকে ভর্ৎসনার সুরে বললো,– "ঠাকুরের প্রতি তুমি তোমার ঋণ শোধ কর । আরে, আমিই তো ঠাকুরের অলৌকিকতার একটা জীবন্ত উদাহরণ । যদি তিনি না করতেন, তাহলে তোমার পরিবারের সকলের মঙ্গল, স্বাস্থ্য আর কল্যাণ কামনা করেও আমি কিন্তু তোমার বাড়ীতে আবার ডাকাতি করতাম ।"

যজ্ঞেশ্বরের কথার কোন প্রতিবাদ বা বিতর্ক করলো না হরিবন । তার টাকার বাণ্ডিলের থেকে সে ছ" টাকা বের করে দিয়ে দিলো সঙ্গে সঙ্গে । কলকাতার বৌবাজার স্ট্রীটে ঐ একই সন্ধ্যায় একটা টেলারিং-এর দোকানে, কারিগররা যে বেঞ্চে বসে কাজ করে, সেই বেঞ্চেই একটা সাদা চাদর দিয়ে ঢেকে দুটো ফুলদানীতে ফুল দিয়ে সাজিয়ে ঠাকুরের ছবি বসিয়ে সত্যেন মৈত্র একটা প্রার্থনা সমাবেশ করলেন । তিনি জননী মনমোহিনীদেবীর কাছে হিমাইতপুর থেকেই এই শিক্ষা পেয়েছিলেন । প্রার্থনার পর দেওঘরে বিজ্ঞান কলেজের প্রয়োজনীয়তার সমস্ত ইতিবৃত্ত বর্ণনা করলেন । সব শোনার পরে মাসে যারা মাত্র পঞ্চাশ টাকা রোজগার করে, তারাও সকলে এমন কাজে একত্রিতভাবে ছ'টাকা করে দিতে রাজী হলো ।

বেনারস স্টেটের সদস্য দেবেন চৌধুরী, ঠাকুরের একটা রঙিন ছবি বেশ সুন্দর করে সাজিয়ে সকলকে নিয়ে প্রার্থনার পরে, কীর্তন করলেন, ঐতিহ্যবাহী বৈদিক প্রার্থনা, তারপর সৎসঙ্গ আশ্রম থেকে যে চিঠিটা পেয়েছেন তা পাঠ করলেন । চিঠির বিষয় শুনেই মন্মথ মল্লিক বেশ দৃঢ়ভাবে বললেন,–"না, আমি কিন্তু এর কিছুই দিতে পারবো না । যদি ঠাকুর, তাঁর নিজের বা সৎসঙ্গের জন্য কিছু চাইতেন, তাহলে আমি সঙ্গে সঙ্গে স্বেচ্ছায় তা দিতাম । এই তো গত বছর টি.বি. হাসপাতালের জন্য, তার কয়েক মাস আগে দেওঘর পৌরসভার পাঠাগারের জন্য, আর এখন আবার এই বিজ্ঞান কলেজ, –এটা তো পারি না! এখন কিন্তু সত্যি সত্যিই একটা বোঝাপড়া করে নেবার সময় এসেছে ।"

এরকম কঠিন স্পষ্ট কথাতে তার স্ত্রীর মনে বেশ কষ্ট হলো । সে হাঁ করে তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে থেকে বললো,– "আচ্ছা, আমরা তখনও তো দীক্ষা নিইনি, সৎসঙ্গীও হইনি । দেশ ভাগের সময় ঠাকুর যদি সৎসঙ্গের ভিতরে আমাদেরকে আশ্রয় না দিতেন, তবে আমাদের কী অবস্থা হতো বলো তো?"

"আমি তো তার জন্য কৃতজ্ঞতায় একটা চেক পাঠিয়ে দিয়েছি ।"

কিন্তু ঠাকুর তো আর তোমার সেই চেক পাওয়ার আশা-ভরসাতে তোমাকে সাহয্য করেননি । তিনি তো প্রত্যেককেই সাহায্য করেছেন । যে এসেছে তারই জন্য করেছেন । কোন প্রশ্ন ছাড়াই ।"

"হ্যাঁ, ঠাকুরের কাজের রাস্তাই তো ওটা ।"

"তাই যদি হয়, তবে তাঁর কাজ করার রীতি নিয়ে এখন আবার কেন প্রশ্ন করছো তুমি?"

স্বামী-স্ত্রী দুজনে পরস্পর তর্কবিতর্কের মতো আলোচনা করতে লাগলো । তারপরই তার স্ত্রী তাকে একেবারে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে জানালো,–"দেখ, যেমন করেই হোক, যেসব মানুষদের সাহায্য করছেন, তারা আমাদেরই হোক বা না হোক, এটা তো সব সময়ে জনগণের কাছ থেকে নিয়েই ঠাকুর কাজ করছেন কাজটা তো চলছেই ।"

তার স্ত্রী কথা শুনে বেশ কিছুটা অনিচ্ছার সঙ্গে মন্মথ আর স্ত্রীর মোট বারোটা টাকা দিতে সে রাজী হলো ।

শ্রীশ্রীঠাকুর সুবিধামতো সময়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য পণ্ডিত বিনোদনন্দ ঝাঁ-কে সংবাদ পাঠালেন । কয়েক সপ্তাহ পরে একদিন বিকালে চা পান করে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এলেন । ঠাকুর তাঁর বড় ছেলে সৎসঙ্গে 'বড়দা' বলে পরিচিত, তিনি, পণ্ডিত ঝাঁ-এর হাতে মোট পঞ্চাশ হাজার চারশো উনিশ টাকার একটা চেক তুলে দিলেন ।

হাতে চেকটা নিয়েই তার অঙ্কের দিকে তিনি তাকালেন । আর তারপরই শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে বিস্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন । বেশ কিছুক্ষণ যেন কথা বেরুলো না । তাঁর সমস্ত শরীরটা যেন ঠাকুরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় কাণায় কাণায় পূর্ণ হয়ে গেল । তার চেহারার অবয়বই যেন জানাচ্ছে তার মনে ভাব, এত বিশাল সংখ্যক মানুষ বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থেকেও, ঠাকুরের প্রতি ভক্তি আর নিষ্ঠাতে, তাঁর এমন বিস্মিত ভাব লক্ষ্য করে ঠাকুর বললেন,– "আমাগরের সব মানষেই আপনার মহৎ ইচ্ছার পরিপূর্ণতাক্ দেখফের চায় ।"

সন্দীপনায় যে কোন লেখা পাঠাতে এই মেইল নাম্বারগুলোতে পাঠান–

E-mail: tapas.satsang@gmail.com
tkroy@rocketmail.com

ছন্দে ছড়ায় জীবন আলো

(অনুশ্রুতি ২য় খণ্ড)

–শ্রীশ্রীঠাকুর

একের পক্ষে অন্য বিশেষ
হানিপ্রতুল বুঝবি যেমন,
সেমনি ক'রে রাখবি তা'কে
দক্ষ-বুঝে জানবি যেমন। ২৫।

স্বাধীন ইচ্ছা সবার আছে–
নষ্টে যাও বা বৃদ্ধি পাও,
জীবন-বৃদ্ধির করলে খতম
বেঁচে বাড়ার হারাবি দাঁও। ২৬।

স্ব-এর অধীন যে-ইচ্ছাটি
স্বাধীন ইচ্ছা তা'রেই কয়,
যেমন পথে চলবে তুমি
পাবেই তা'তে যেটা হয়। ২৭।

ভরদুনিয়ার তথ্য যত
তত্ত্ব তাহার সব জেনে,
জীবন-বৃদ্ধির যজ্ঞে লাগা–
আধিপত্য সেইখানে। ২৮।

জীবনে চলে জীবন-ধারা
সঙ্গে চলে প্রতিরোধ,
সত্তা-জীবন ব'র্ত্তে তা'তেই
আপদ্-ব্যাধি করে নিরোধ। ২৯।

হরকসমের এই দুনিয়া
সাত্বত ধৃতি কুড়িয়ে নিয়ে,
চায়ই যে রে থাকতে ভবে
হৃদয়টি তা'র বিছিয়ে দিয়ে। ৩০।

সৃষ্টির যেটা পরিক্রমা
ভাববৃত্তির বিভর নিয়ে,
সঙ্গত চলায় সাজিয়ে করে
ব্যাপ্ত, বিভায় মূর্ত্তি দিয়ে। ৩১।

সুনিয়ত আবর্ত্তনশীল
দেখিস্ নাকি জগৎখানা,
আবর্ত্তনে যায় না ভেঙ্গে–
সত্তা দিয়েই জগৎ টানা;

আবর্ত্তনে যতই থাকিস্
কৃতি-তপে নিশিদিন,
আবর্ত্তনই রাখবে ধ'রে–
বিবর্ত্তনে হ'বি না হীন। ৩২।

দুনিয়ার ওজন যতখানি
কৃতিসৃষ্টি তেমন নয়,
যতই ভার না জোগাস্ তোরা
জগৎ ধৃতি-সাম্যে রয়। ৩৩।

সৃষ্টিরই এই কৃষ্টি এমন
প্রকৃতিরই বিধান এই,
জীবন-প্রকৃতি অকৃতি হ'লে–
ঠকবে জানিস্–নিরেট সেই। ৩৪।

সৃজনধারার গতি অশেষ
বলে তো তাই অনন্ত,
প্রকট হ'য়ে যা, থাকে তা'ই–
স্থির, চলন্ত, শান্ত। ৩৫।

আত্মিকতার স্রোত-কম্পন
সেথায় যেমন ধ্বনি আনে,
বিধান-সহ আস্তিকতায়
রাখে অমনি জীবন-প্রাণে। ৩৬।

স্বতঃস্ফূর্ত্তি যে-কল্পনা
অস্তিনেশায় ডেকে আনে,
তা'রই শব্দ অনাহত–
জ্ঞানীজনা তাই তো ভণে। ৩৭।

আহত নয় এমন থেকে
কম্পন-শব্দ যা, আসে,
অনাহত তা'কেই বলে
যেমন রেণু ত্রসে ভাসে। ৩৮।

ত্রসরেণুর বিলোল আলো
রশ্মিতে যেমন চলৎশীল,
আত্মিক গতি তেমনি ক'রেই
বিকিরণায় চলায় মিল। ৩৯।

গতিস্পন্দন যেমন শব্দ
ক'রে থাকে যেমন প্রকাশ,
তেমনতরই হ'য়ে থাকে
শরীর, মন আর সত্তা-বিকাশ । ৪০ ।

চলাফেরার নাচন-তালে
কম্পনার যে-নন্দনা,
সংঘাতে তা'র হয় তেমনি–
জাগে তেমনি এষণা । ৪১ ।

গতির বেগের প্রতিফলন
যেমনতর উচ্ছলা,
আবেগ সৃষ্টি ক'রে চলে
তেমনতর সচ্ছলা;
ভাব আবির্ভাব হ'য়ে তখন
হওয়ার দানা সেটে বেঁধে,
বিধানটাকে বিনায়িত
করে তেমন হওয়ার হ'তে । ৪২ ।

ঠোক্করেতে ধাক্কা লেগে
যেমনতর কাঁপন হয়,
ঐ সংঘাতে আলোর সৃজন
উথলে ভাব-মূর্চ্ছনায় । ৪৩ ।

অবিনাশী আত্মা অমর
ধৃতি-চেতন আত্মাই,
কৃতি-উচ্ছল আত্মাতেই হয়,
জীবনদ্যুতি আত্মাই । ৪৪ ।

জন্ম-কর্ম্ম যা'ই না তোমার
আত্মাই যে তার মূলাধার,
সত্তাপোষী যা' সব কর্ম্ম
স্থিতি বাড়ায় তা'তেই ত'ার । ৪৫ ।

পদার্থই তো আত্মার বিভব
ওতেই তো তা'র উদ্ভাবন,
পদার্থকে বিনিয়ে নিয়ে
সৎ-অর্থে কর্ নিয়মন । ৪৬ ।

আত্মাই তো জীবনগতি
যা'ই কিছু হোক্ তা' সবার,
ঐ সম্বেগেই সংস্থিত সব
জীবনও তাই অঢেল অপার । ৪৭ ।

জীবন-গতি যেথায় যেমন
আত্মা জানিস্ তা'রে কয়,
ধারণ-পালন-সম্বেগ ছাড়া
আত্মা কোথায় দৃপ্ত হয়? ৪৮ ।

পূর্ব্বকালের চেতন-স্মৃতি
পরকালে ব্যক্ত হ'য়ে,
পূর্ব্বকালের সেই তো মানুষ
পরকালে আসছে ব'য়ে । ৪৯ ।

ফাঁকা স্বপ্ন জীবনটাই–
ভেবে তোমার ফয়দা কোথায়!
কায়দা-কুশল কৃতি হ'লেই
কায়দা নেবে ফয়দা সেথায়;
মিথ্যা স্বপন নিয়ে কেন
ঘুমাবি বল্ নিরবধি?
সেধে নে তোর সত্তাটিকে
তপস্যায় রাখ্ জীবনাবধি । ৫০ ।

আত্মাই তো জীবন-গতি
যে সম্বেগে জীবন চেতন,
মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার
বিধানমাফিক হয় উদ্বোধন,
এমনি ক'রেই সারা বিশ্বে
আত্মিক গতি চলৎশীল,
জীবন-ব্যাপী সম্বেদনায়
বিধান যত জীবনশীল । ৫১ ।

ব্যাপ্তি-যজ্ঞে ধৃতি যখন
পরিচর্য্যায় প্রত্যেকের–
জীবনপালী দীপনরাগে
ঘোষেই যে জয় বিস্তারের । ৫২ ।

বর্দ্ধনারই অনুপ্রভায়
দীপ্ত ব্রহ্ম করেন বাস,
জীবনীয় উৎসর্জ্জ নাই
ব্রহ্মত্বেরই প্রাণন-শ্বাস । ৫৩ ।

বর্দ্ধনাই তো ব্রহ্মের রূপে
সব অন্তরে লুকিয়ে রয়,
যে যেমন হোক তেমনি ক'রেই
বর্দ্ধনাকে সবাই চায় । ৫৪ ।

মাতৃদীপনা

(মায়েদের জন্য বিশেষ সাহিত্য আসর)

সেবা বিধায়না

–শ্রীশ্রীঠাকুর

যা'রা সেবা-সন্ধিৎসু অর্জ্জন-উন্মুখ,–
তা'রা অল্পমাত্র প্রেরণা বা সাহায্য পেলেই
কৃতি-উৎসারণা নিয়ে
নিজের ও অন্যের
সত্তাপোষণার সহায়ক হ'য়ে উঠতে পারে,
অনুচর্য্যী উৎসারণায়
পার তো তা'দের সাহায্য কর;
আর, যা'দের সাহায্য ক'রলে
বা অনুপ্রেরিত ক'রে তুললে
গৌণে অর্জ্জন-উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠতে পারে,–
পরিচর্য্যায় দ্বিতীয় স্থান তা'দেরই;
অর্জ্জন-সম্ভাব্যতা আছে যা'দের–
তা'দের সাহায্য ক'রলে
অনেকে পরিপোষিত হ'য়ে উঠতে পারে,
তাই, সর্ব্বাগ্রে এদের সাহায্য ক'রে
অন্যকে যতটা পার কর;
এদের জন্য না ক'রে
যা'দের দ্বারা তা'রা নিজেরা বা অপরে
কেউই পরিপোষিত হয় না,
তা'দের যতই সাহায্য কর–
তা'রা কিছুতেই অর্জ্জনপটু হ'য়ে উঠবে না,
বরং তা'রা তোমাতে নির্ভরশীল হ'য়ে
না-পারার খেলোয়াড় হ'য়ে দিন কাটাবে;
তা'দের সাহায্যের পরিমাণ
অন্যায্যভাবে বাড়িয়ে তুলবে যতই,
দেউলিয়ার পথে অগ্রসর হ'তে থাকবে
তেমনতর,
কারণ, তা'দের লোকপরিচর্য্যার প্রবৃত্তি কম,
তা'রা পোষক হ'তে চায় না,
শোষক হ'য়েই দিন কাটাতে চায়–
নানারকম খেয়ালের দার্শনিক ভাঁওতায়
বা অজুহাতের বায়নায়
অন্যকে ধাঁধিয়ে দিয়ে;
তাই মিতি-বিবেচনা নিয়ে
যেখানে যেমন ক'রবার তাহা-ই কর;
মনে রেখো–
যা'দের সাহায্য ক'রলে বা সুযোগ দিলে
সাধু-সন্দীপনায় কৃতী হ'য়ে উঠবে
অর্জ্জনপটু হ'য়ে উঠবে,–
তা'রাই তোমার সাহায্যের
প্রথম ও প্রধান স্থান। ২২৮।
যা'রা শ্রেয়কে ভালবাসে,
তাঁ'র সঙ্গ, সাহচর্য্য ও সেবা ছাড়া
কিছুই ভাল লাগে না
ব'লে থাকে,
অথচ তাঁ'র কোন্ অবস্থায়
কী প্রয়োজন
সেদিকে সন্ধিৎসু নজর নেইকো,
বা তা'র উপকরণ-সংগ্রহে উদাসীন,
তাঁ'র যখন যেটুকু প্রয়োজন
তা' বুঝে নিজেকে তেমনতর
প্রস্তুত ক'রে তুলতে পারে না,
অনুচর্য্যী নজর দিয়ে
তাঁর অবস্থাকে বিবেচনা ক'রে
বিহিত ব্যবস্থাও ক'রতে পারে না,
প্রয়োজনের পূর্ব্বে সংগ্রহ ক'রে
বিহিত বিনায়নী ব্যবস্থায়
সেগুলিকে আয়ত্তে এনে,
সুদর্শিতা ও বোধি-বিনায়িত সংগ্রহের
অন্বিত তৎপরতায়
তাঁ'কে সার্থক ক'রে তুলে,
নিজেকে উপযুক্তভাবে
যোগ্যতায় সাজিয়ে রাখার
আকূতি যা'দের নেই,
সেবা-আর্তি আছে–ভাবে,
কিন্তু তৎক্রিয়াসম্পন্ন নয়কো যা'রা,–
বুঝে রেখো–
অনুচর্য্যা বা সেবা
তা'দের আন্তরিক আগ্রহ নয়কো,
সেবা বা অনুচর্য্যার বাহানায়
প্রত্যাশা ও অলস উপভোগ-আপূরণ-প্রয়াসী হ'য়ে
চলাই তা'দের স্বভাব,
তাই, তা'রা বোধ ও বিবেচনায়
সক্রিয়ভাবে সেবা-প্রস্তুতিকে
সুন্দর বিন্যাসে
বিহিতভাবে বিনায়িত ক'রে চ'লতে পারে না;

এমনতর যা'রা
তা'রা প্রত্যাশা বা উপভোগ-মত্ত
ভাবালু সেবক ছাড়া
আর কিছুই নয় তখনও । ২২৯ ।
তুমি চাকুরী-জীবিই হও,
আর ব্যবসায়ীই হও,
প্রত্যাশাকে মুখ্য ক'রেও যদি চল,
তা' হ'লেও অন্ততঃ–
অশক্ত, মহৎ ও পুণ্য-প্রতিষ্ঠানে
আত্মনিয়োগ করেছেন যাঁ'রা–
তাঁ'দের কাছ থেকে
কিছু না নিয়ে
আরোতর অন্তরাবেগে
তাঁ'দের শুভচর্য্যা ক'রবার
সৌভাগ্য যদি জোটে
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তা' ক'রো,
নির্ব্বাহ ক'রো–
অস্তিত্বকে অক্ষুণ্ণ রেখে;
এর ভিতর-দিয়ে
প্রত্যাশাভিভূত হ'য়ে
ব্যক্তিত্বকে সঙ্কীর্ণ ক'রে ফেলার বিরুদ্ধে
তোমার প্রবণতা খানিকটা
পরিপোষিত হবে,
ফলে, তোমার ব্যক্তিত্ব
ব্যাপ্তি লাভ ক'রতে থাকবে
অনেক ব্যষ্টিতে,
এবং ওই প্রীতি-প্রণোদিত সেবাই
তোমার পসার বাড়িয়ে
উপার্জ্জনকে স্বতঃ ক'রে তুলবে;
মনে রেখো–
প্রত্যাশালুব্ধ হ'য়ে যতই চলবে,–
সঙ্কীর্ণতরও হ'য়ে উঠবে তেমনি,
উপার্জ্জনও সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠবে
ততটুকু;
কিন্তু তুমি যদি
সেবার সৌভাগ্য পেয়ে
বাস্তবে উদ্‌যাপন কর তা'কে–
সুষ্ঠু সৌকর্য্যে,
মানুষও তখন সুযোগ পেলে
তা'দের সাধ্যমত
তোমার সেবায় আত্মনিয়োগ ক'রতে
বিরত হবে না–
স্বতঃ-অনুবেদনায়;

তোমরা পরিচর্য্যা
যতই প্রতিটি ব্যষ্টিতে
পরিব্যাপ্ত হবে
প্রত্যাশালুব্ধ না হ'য়ে,–
প্রীতি-অর্ঘ্য যা'র যা' জোটে,
তা' তোমাকে দিয়ে
মানুষ আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রতে
বঞ্চিত হ'তে চাইবে কমই,
ফলে, তোমার আয়ও ব্যাপ্তিলাভ ক'রবে–
যদিও তোমার পরিচর্য্যা
প্রত্যাশালুব্ধ নয়কো;
শিব-সুন্দর পরিব্যাপ্ত
প্রতিটি ব্যষ্টিতেই,
আচার্য্যকেন্দ্রিকতায়
প্রতিটি ব্যষ্টির শুভ-অনুচর্য্যায়
যতই তৎপর হ'য়ে উঠবে,–
তোমার উপার্জ্জনের ব্যাপৃতিও
বেড়ে যাবে ততই । ২৩০ ।

কা'রও সৎ বা শুভ প্রয়োজনে
সক্রিয় অনুবেদনায়
প্রত্যাশাবিহীন হ'য়ে
তা'কে যদি সাহায্য না কর,
তা'র সহায় না হও,
এতটুকু ত্যাগ-স্বীকারের
আত্মপ্রসাদী অনুকম্পা
যদি না থাকে তোমার,
তুমি প্রত্যাশা ক'রতে পারবে না–
তোমার প্রয়োজনে
কেউ তোমাকে
এমনতর সক্রিয় অনুকম্পা নিয়ে
ত্যাগী আত্মপ্রসাদে সাহায্য ক'রবে;
তাই, তুমি মানুষের নিঃস্বার্থ অনুকম্পী
সক্রিয় অনুকম্পা যদি চাও,–
সৎ ও শুভ-প্রয়োজনে
তা'কে তেমনি সাহায্য কর–
নিরাশী হ'য়ে,
প্রত্যাশাপ্রলুব্ধ হ'য়ে নয়কো;
তোমার জীবনে ঐ প্রবৃত্তি ও প্রবণতা
যতই প্রবল হ'য়ে চ'লতে থাকবে,
লোক-অনুকম্পা
ঐশী অনুবেদনা নিয়ে

(চলবে)

'বাণী তব ধায় অনন্ত গগনে গগনে লোকে লোকে ।' যুগে-

বাণী তব ধায়

প্রীতিগোপাল দত্তরায়

যুগান্তরে পরমপ্রেমময় পুরুষোত্তমের পবিত্র বাণী ধেয়ে চলেছে মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের অদ্যর্থ অনুশাসন বহন করে। অত্র আমরা বর্তমান যুগপুরুষোত্তম শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের বাণী-সাহিত্যের কথঞ্চিত আলোচনায় ব্রতী ।

"ঠাকুর চাইতেন-মানুষের গন্তব্য কি এবং করণীয় কি সে সম্বন্ধে মানুষ যেন সর্বদা সচেতেন থাকে । প্রার্থনার মধ্য দিয়ে সেইটি আমাদের হয় । ঠাকুরের প্রার্থনার প্রথম অঙ্গটি হল 'আহ্বানী' । 'আহ্বানী আমার নিজেরই নেবার সুযোগ হয় । ১৯৪০ সালের ৯ই কি ১০ই জানুয়ারি, সকালবেলা । ঠাকুর কাজলদার ঘরে বসে আছেন । আমি যেতেই ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন-'আদিত্য' মানে কি dictionary (অভিধান) দেখতো দেখি । দেখা হল । এই 'আদিত্য' থেকেই 'অচ্ছেদ্য' করা হল । তারপর পুরো স্তোত্রটা দিলেন-"তমসার পার অচ্ছেদ্যবর্ণ মহান পুরুষ ইষ্টপ্রতীকে আবির্ভূত----ঋদ্ধিমান হই । স্বস্তি স্বস্তি ।" -প্রফুল্লকুমার দাস, পুরুষোত্তমজননী শ্রীশ্রীমনোমোহিনী (প্রণেতা, ব্রজগোপাল দত্তরায়, সম্পাদনা, রজতবরণ দত্তরায়) গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত ।

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রধান বাণী -অনুলেখক শ্রদ্ধেয় প্রফুল্লকুমার দাসের কথায় আমরা জানতে পারি কি ভাবে ১৯৪০-এর জানুয়ারির এক শীত-সকালে সৃষ্টি হয়েছিল এক পরমদিব্য স্তোত্র-শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুপম প্রার্থনা-সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য পবিত্র পুরোহিত মন্ত্র 'আহ্বানী' । 'আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ' - উপনিষদ্ দর্শনের নবতর সংস্করণে পুরুষোত্তমের প্রত্যক্ষ অনুভূতির অভিপ্রকাশ বহন করে আবির্ভূত হল । –'তমসার পার অচ্ছেদ্যবর্ণ মহান পুরুষ-- ।'

শ্রদ্ধেয় প্রফুল্ল-দা বর্ণিত আহ্বানীর ইতিহাস থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা-ভাষা-সাহিত্য তথা বাণীর কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আমরা খুঁজে পাই । প্রথম কথা হল-শ্রীশ্রীঠাকুরের শব্দ-চয়ন ও ব্যবহার । স্বীয় অপরোক্ষ প্রমা ও অনুভূতির পরিপূর্ণ অভিনব প্রকাশের উদ্দেশ্যে শব্দ ও ভাষার ব্যবহারে শ্রীশ্রীঠাকুর ছিলেন অত্যন্ত সযত্ন, সতর্ক ও সচেতন । অন্বিষ্ট তত্ত্ব ও অন্তর্নিহিত ভাব সার্বিক সুসমন্বয়ে প্রমাদশূন্য নিঁখুত দ্যোতনা ও ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করতে শব্দ ও ভাষার ব্যবহারে শ্রীশ্রীঠাকুরের অভিনিবেশ সত্যই বিস্ময়কর ।

এই উদ্দেশ্যে অগণিত নতুন শব্দ তিনি সৃষ্টি করেছেন, বহু পুরনো শব্দ ব্যবহার করেছেন নতুন ব্যঞ্জনায় । নতুন সৃষ্ট শব্দগুলি প্রধানত তৎসম শব্দের মূলীভূত ধাতু-উৎসের অর্থ ব্যঞ্জনা বিশ্লেষণ করে নিজের বিশিষ্ট ভাব ও অনুভূতি প্রকাশের উপযুক্ত বাহনরূপে নির্মিত । অপরাপর ভাষার, এমন কি বিদেশি ভাষান্তর্গত বহু শব্দের মুলানুসরণে ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে যাচাই করে অনেক শব্দ সৃষ্টি হয়েছে । শ্রীশ্রীঠাকুর সৃষ্ট শব্দগুলি, যেমন যোগজৃম্ভী, অধ্যাস, অন্তরাসী, ঊর্জ্জী, দুধুক্ষা, দ্বিজাধিকরণ, ইত্যাদি- ধ্বন্যাঢ্য এবং তাদের ধ্বনি-ব্যঞ্জনার ঐশ্বর্য প্রতিপাদ্য বিষয়ের বাচনে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে । বহু পারিভাষিক শব্দও শ্রীশ্রীঠাকুর সৃষ্টি করেছেন- ঋদ্ধ হয়েছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভাণ্ডার । নতুন শব্দ-সৃষ্টিতে ক্রিয়াত্মক পদ-বিন্যাস-যেমন, বিধায়না, বিনায়না, নিয়মনা, অনুবেদনা, ইত্যাদি- শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনধর্ম এবং তদ্বাচক জীবনবেদে এক বিশিষ্ট তাৎপর্য বহন করে । প্রয়োজন সাপেক্ষে আবার অর্ধতৎসম, তদ্ভব, কথ্য এবং দেশি-বিদেশি কথাও ঠাই পেয়েছে শ্রীশ্রীঠাকুরের সাহিত্যে । প্রধানত আলোচনা ও কথোপকথন সাহিত্যে বহু ইংরাজি শব্দও অকাতরে ব্যবহৃত হয়েছে । শব্দ সৃষ্টি ও শব্দের ব্যবহারের নিরিখে সাধু-চলিত সমস্ত রকমের বন্ধনের আগল ভেঙে এক অত্যন্ত আধুনিক, সাহসী-বলিষ্ঠ, গতিময়, শক্তিশালী বাচনশৈলী ও কথা-সাহিত্যের জন্ম দিয়েছেন শ্রীশ্রীঠাকুর ।

কেবল এক-একটি শব্দ নয়, বিশেষ শব্দগুচ্ছ এবং বাক্যবন্ধন ব্যবহারেও শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশিষ্টতা নজর এড়ায় না । নিজ-অনুভূত নির্দিষ্ট বক্তব্যকে অদ্যর্থ পূর্ণাঙ্গ সুসমন্বয়-সৌকর্য-শালীন্যে প্রকাশ করার জন্য বিচিত্র শব্দ-শব্দগুচ্ছ-বাক্যাংশের সন্ধানে শ্রীশ্রীঠাকুর ছিলেন ধনঞ্জয়-তীরবৎ অব্যর্থ । যেমন, স্ত্রী-পুরুষের পারস্পরিক বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যবহার করেছেন 'বিপরীত সমসত্তা'-র মতো অভাবনীয় শব্দগুচ্ছ ।

বাক্যের গঠনেও তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত প্রাঞ্জল স্বকীয়তা আমাদের মুগ্ধ করে । যেমন, সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনায় সৃষ্টির একটি নির্দিষ্ট স্তরকে নির্দেশ করেছেন অপূর্ব ভঙ্গিমায়-'যখন ছিলনা-র সত্তা ছিল ।'

শ্রদ্ধে প্রফুল্ল-দা-কথিত আহ্বানীর ইতিকথা থেকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা জানতে পারি অনুকূল-সাহিত্য সম্পর্কে । এই বিশাল গম্ভীর সাহিত্যের জন্ম কোনও নিভৃত নির্জনে একান্তে গোপনে নিঃশব্দ ধ্যানস্থ অবস্থায় হয়নি ।

-যে কোনও কাব্য, কথা বা মন্ত্র সাহিত্য সম্পর্কে যা আমাদের সনাতন ধারণা । অনুকূল-সাহিত্যের আতুর ঘর অনুকূল-আশ্রম তথা সৎসঙ্গের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ, পরিবেশ ও পরিমণ্ডল । অসংখ্য মানুষেরর মাঝখানে অনর্গল স্বাভাবিক নিসর্গে এই সাহিত্যের জন্ম । সব মানুষের অবাধ যাতায়াত, কথাবার্তা, কলহ-কলতান ইত্যাদি জাগতিক শতেক প্রতিবন্ধকতার মধ্যে বিপুল গভীর ভাগবত সাহিত্যের সৃষ্টি যিনি প্রতি

মুহূর্তে করে গেছেন, তাঁর প্রজ্ঞা ও অনুভবের নিশ্চয়াত্মিকতা, অফুরন্ত স্থৈর্য-ধৈর্য-মনস্বিতা-ঋষিতা-একাগ্রতা এবং অচ্যুত যোগাবেগের তল খুঁজে পাওয়া সত্যই আমাদের সাধ্যাতীত। এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় প্রফুল্ল-দা তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অপূর্ব বর্ণনা করেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের বাণী সংগ্রহ 'সম্বিতীর' অবতরণিকায়।

"এত সব গভীর জিনিস যে কি হৈ-হল্লা, গোলমাল ও বাধা বিঘ্নের ভিতর দিয়েছেন-তা ভেবেই অবাক হয়ে যেতে হয়। প্রেরণা বা প্রয়োজনের তাগিদে তিনি হয়ত' একটা বাণী দিতে শুরু করেছেন-এত উচ্চগ্রামে, এমন মিহি পর্দায় কথা চলছে, যে শ্বাস প্রশ্বাসটাকেও একটা বাধা মনে হয়, ঠিক তখনই হয়ত' পাশে একটা ছেলে গলা পঞ্চমে চড়িয়ে কেঁদে উঠলো, কিম্বা এক দল শিশু খেলতে খেলতে অট্টহাসি শুরু করে দিল, অবুঝ এক দল অদূরেই তুমুল ঝগড়া লাগাল, অথবা কেউ পট করে এসে বলল, "বাবা! আমার তো এ বেলা খাবার কিছু নেই"-"খোকার নিউমোনিয়া হয়েছে, ডাক্তার বলছে পেনিসিলিন দিতে, কি করব?" –ইত্যাদি। এছাড়া ব্যাধি-জীর্ণ দেহের ক্লেশ এবং অসংখ্য লোকের শারীরিক ও মানসিক দুঃখ-দুর্দৈবের দুর্ব্বহ বোঝাও তাঁর মাথার উপর সব সময় চেপেই আছে। এত বিক্ষেপের মধ্যে সুক্ষ্ম ভাবধারাকে অবলম্বন করে অন্তর্নিবিষ্ট নিক্ষিপ্ত, বিচিত্র বাক্যাবলি সম্বলিত ২০/২৫ লাইন পর্য্যন্ত দীর্ঘ এক-একটি জটিল বাক্য কেমন ক'রে নির্ভুলভাবে বলে যান তা' ভাবতে গেলেও বিস্ময়ের অবধি থাকে না।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী-সাহিত্যের সৃষ্টি সম্পর্কে দু'টি প্রাথমিক বিষয় মনে রাখা দরকার। এক, এই সাহিত্য-কৃতির অতি অল্প অংশই (সত্যানুসরণ' মূল গ্রন্থ, তাঁর হাতে লেখা চিঠি ইত্যাদি বাদে) দয়ালের স্বহস্তে লিখিত। প্রধানত, তিনি মুখে যা বলতেন, তা-ই অনুলেখন করে ধরে রাখা হত। দুই, শ্রীশ্রীঠাকুর সাধারণত কোনও বিষয় পূর্ব থেকে নির্বাচন করে, নির্ধারণ করে বাণী প্রদান করতেন না। উপস্থিত জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও আর্ত মানুষ যে প্রশ্ন বা সমস্যা তাঁর কাছে উপস্থাপিত করতেন, কিংবা মানুষ ও প্রকৃতি থেকে যে উদ্দীপনা উদ্রিক্ত হত, -সেই বিষয় অবলম্বন করে ঠাকুরের তাৎক্ষণিক আলোচনা বা বাণী অনুকূল-সাহিত্য রূপে গড়ে উঠেছে। ঠাকুর প্রায়ই একটা কথা বলতেন-তাঁর মধ্যে সব সত্য ঘনীভূত হয়ে Passive আকারে জমাট বেঁধে আছে। বাইরে থেকে Knock করলে তা নির্দিষ্টরূপ নিয়ে বেরিয়ে আসে। এইভাবে টোকা দিয়েই শ্রদ্ধেয় ঋত্বিগাচার্য কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য ইংরেজিতে এক বিশাল বাণী-সাহিত্য এবং বাংলা ছড়ার এক বিরাট সম্ভার শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখ থেকে সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিলন।

অনুকূল-সাহিত্যের বিভিন্ন আঙ্গিকের মধ্যে তুলনামূলক বিচারে, একথা স্বীকার করতেই হয়, তাঁর গদ্যবাণীর (আদর্শ বিনায়ক, ধৃতি-বিধায়না, চর্য্যা-সুক্ত ইত্যাদি গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ) প্রথম পাঠেই পুরোপুরি অনুধাবন করা সাধারণের পক্ষে কিছুটা দুষ্কর। গদ্যবাণীগুলি অন্তগর্ত বিষয় বৈভবে এ যুগের ঋক সংহিতা-সূক্তবৎ, মন্ত্রবৎ। সুক্ত বা মন্ত্রের মর্মোদ্ধারে নিশ্চয়ই শরীর-মানসিক আধ্যাত্মিক যথোপযুক্ত প্রস্তুতি ও শুদ্ধতা এবং বিষয় ও তার প্রকাশের বিশেষ ভঙ্গি ও তদানুপাতিক পঙ্‌ক্তি বিন্যাস, বিরাম বা যতি চিহ্নের ব্যবহার ইত্যাদি বহিরঙ্গের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পূর্ব-পরিচিতি প্রয়োজন। শ্রদ্ধেয় প্রফুল্লদা আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করেছেন এই প্রসঙ্গে। "কথঞ্চিৎ কাঠিন্যের আর একটা কারণ এই যে, সব জায়গায়ই তিনি মরকোচ উদ্ঘাটিত করতে চেষ্টা করেছেন, কোন একটা জিনিস কেন ভাল, বা কেন মন্দ, তা' তিনি কার্যকারণসহ চূড়ান্ত বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন- এর উদ্দেশ্য মানুষের বোধি ও প্রত্যয়কে উদ্বোধিত করে তাকে সৎপ্রণোদনায় প্রদীপ্ত এবং অসৎনিরোধ ও পরিহারে কৃতসংকল্প করে তোলা।" (অবতরণিকা, সম্বিতী)।

বস্তুত, শ্রীশ্রীঠাকুরের গদ্যবাণীগুলি যুগপৎ তীক্ষ্ণ বিশদ বিশ্লেষণী এবং কেন্দ্রায়িত সুসমন্বিত সংশ্লেষণী। ফলতঃ, প্রতিটি বাণীই প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ-নির্দিষ্ট আলোচ্য বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ এবং ঐ বিষয়ের সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের সামগ্রিক জীবনবেদের মৌলিক যোগান্বেষণের অপূর্ব সংশ্লেষণের যোগাবহে পরিপূর্ণ। ঠাকুরের গদ্যবাণী, শুধু গদ্যবাণী কেন, আলোচনা-সাহিত্য সহ সকল আঙ্গিকেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও জ্ঞানচর্চার এটি একটি বিশিষ্ট নির্ণায়ক চরিত্রধর্ম।

শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ বাণী-অনুলেখকেরা চেষ্টা করেছিলেন তাঁর ভাষার আপাত কাঠিন্য কিছুটা হলেও দূর করা যায় কিনা, ভাষাতাত্ত্বিক অনুশীলনে এই প্রচেষ্টা বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। এই প্রয়াসের ফল কি দাঁড়াল, তা শ্রদ্ধেয় প্রফুল্লদার অকপট স্বীকারোক্তি থেকে উদ্ধৃত করা গেল।

"অনেকে বলে থাকেন শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাষা কঠিন। আমরাও সেই বুদ্ধিতে অনেক সময় তাঁর ভাষার কাঠিন্য সরল করে তুলতে ব্যর্থ চেষ্টা করতে কসুর করিনি। যেখানেই সরল করতে চেষ্টা করেছি, সেখানেই দেখতে পেয়েছি, তাঁর মূল বক্তব্যের অনেকখানি কথাই বাদ পড়েছে, কিম্বা তাঁর ভাবটা অবিকৃত রাখতে গিয়ে দু'লাইনের লেখাটা পাঁচ লাইনে পরিণত হয়েছে- তখন তা' হয়ে গেছে নির্জীব-তার ভিতর সে জোর নেই, নেই সে প্রেরণার প্রাণবীজ-সেই উচ্চেতনী মন্ত্রশক্তি, তখন সে পণ্ড প্রয়াস ছেড়ে দিয়েছি। এমন কি একটা শব্দ পর্যন্ত পরিবর্তন করতে গিয়ে আমরা ব্যর্থকাম হয়েছি, হয়তো আধ ঘন্টার চেষ্টার পর বুঝতে পেরেছি, ও জায়গায় ঐ বিশিষ্ট শব্দটাই একমাত্র বাচক।" (অবতরণিকা, 'সম্বিতী')।

শ্রীশ্রীঠাকুরও ভক্তদের উৎসাহিত করতেন তাঁর ভাষা সরলীকরণের প্রয়াসে। এই প্রসঙ্গে দীপরক্ষী (দ্বিতীয় খণ্ড, ২০/০৯/১৯৫৭) থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ উদ্ধৃত করা গেল।

"শ্রীশ্রীঠাকুর (আনমনে বলছেন)-আমার এই ভাষাগুলি

কেমন হয়ে যায়। ভাষাগুলি যদি সরল করে দিতেন তাহলে ভাল হত।

কেষ্টদা (ঋত্বিগাচার্য কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য) -এ তো নতুন একটা Style (শৈলী) হ'য়ে গেছে। এতে আপনার নিজস্ব একটা coining (শব্দ গঠন) আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর– সে হয়েছে, মানে আমি কিভাবে express (প্রকাশ) করব তার ভাষা খুঁজতে যেয়ে ঐরকম হয়ে গেছে।

কেষ্টদা–তাহলেও আপনার ভাষার একটা নিজস্ব গাম্ভীর্য্য আছে, একটা বিশেষত্ব আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর-আমি লেখাপড়া জানলে পরে ঐ রকম হত না। অথবা ইচ্ছা করলে আপনারা বদলায়ে দিতে পারতেন।

কেষ্টদা-না, ও আমরা অনেক sugest (প্রস্তাব) করে দেখেছি। একটা কথা আপনি বলেছেন। সেটা আরো ভালভাবে express (প্রকাশ) করা যায় কিনা তার জন্য আমরা ঢের আলোচনা, বই ঘাঁটাঘাঁটি করেছি। আপনি হয়তো চুপ করেই আছেন। শেষ পর্যন্ত দেখা গেছে, আপনি যা বলেছেন সেটা ছাড়া ওখানে আর কিছু লাগেই না। একটা বলে দিলাম আর সেটা আপনি accept (গ্রহণ) করলেন, এমনটা হয়নি।

গদ্যবাণীর তুলনায়, শ্রীশ্রীঠাকুরের আলোচনা-সাহিত্য (অমিয় বাণী, আলোচনা-প্রসঙ্গে, দীপরক্ষী, ইসলাম প্রসঙ্গে, নারীর পথে, নানা প্রসঙ্গে, কথা-প্রসঙ্গে ইত্যাদি গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ), তাঁর চিঠি পত্রের সংগ্রহ, বাণীগ্রন্থ সত্যানুসরণ, বাংলা ছড়া-সাহিত্য (অনুশ্রুতি, ৭খণ্ড) অনেক বেশি সহজ-বোধ ও প্রাঞ্জল। শ্রীশ্রীঠাকুরের আলোচনাগুলিতে বিশেষভাবে লক্ষণীয়-উত্থাপিত বিষয় এবং যে মানুষটির সঙ্গে কথা হচ্ছে তার বৈশিষ্ট্য, শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদি অনুসারে তাঁর ভাষা ও বাচনশৈলীর পরিবর্তন। শাস্ত্রবিৎ, পন্ডিত, সাধু-সন্ত, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, কবি, সাহিত্যিক, মন্ত্রী, রাজনৈতিক নেতা, বিশিষ্ট আমলা, বিচারক, বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী, ভক্ত, মুমুক্ষ আর্ত, অর্থার্থী প্রভৃতি বহু মানুষ অবিরল ধারায় এসেছেন তাঁর কাছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য মাফিক তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর স্থির সত্যভূমির উপর অবিচল দাঁড়িয়ে তাঁদের মতো করেই তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছেন। প্রত্যেকে নিজ নিজ বোধের পাল্লায় সব প্রশ্নের যথার্থ উত্তরলাভে তৃপ্ত আপূরিত হয়েছেন। রচিত হয়েছে অপূর্বকল্পিত এক অত্যাধুনিক আলোচনা-সাহিত্য। আবার, সম্পূর্ণ নিরক্ষর মানুষের সঙ্গেও communicate করতে ঠাকুরের বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয়নি আলোচনার সময় ঠাকুরের প্রাণখোলা আগলভাঙা হাসি-আনন্দ-মজা-চাউনি-ভঙ্গিমা ও বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য ও ব্যথাহারী সঞ্জীবনী শান্তি-সান্তনা-প্রেরণার অফুরন্ত উদ্বেল উচ্ছ্বাস শ্রীশ্রীঠাকুরের আলোচনা সাহিত্যকে একটি পূর্ণ বাস্তব জীবন শিল্পে পরিণত করে তুলেছে। অনুকূল সাহিত্যের আর একটি বিশিষ্ট ধারা হল আশিষ বাণী। বিবিধ বিচিত্র উপলক্ষে পুরুষোত্তমের উদ্দিপনী আশীর্বাদে ঋদ্ধ এই ধারা।

সহজ-ভাবস্থ অবস্থায় প্রদত্ত এই স্রোতল সাহিত্য মন্দাকিনীর পাশে রয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন মেরুর অত্যাশ্চর্য বাণী-নির্ঝরের এক তীব্র দুর্নিবার উচ্ছ্বাস-সৃষ্টির কারণ-সত্তার সঙ্গে যুক্ত মহাভাবস্থ অবস্থায় উচ্চারিত ভাববাণী। শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাজীবনের প্রথম দিকে-তখনও সৎসঙ্গ আশ্রমের গঠন হয়নি-আমরা পাই কীর্তন ও মহাভাব সমাধির একটি দিব্য-দিব্য যুগ। তখন তুমুল সঙ্কীর্তনের মধ্যে কোনও কোনও দিন শ্রীশ্রীঠাকুর মহাভাব সমাধিতে আবিষ্ট হয়ে পড়তেন। শরীরে প্রাণের সব লক্ষণ তিরোহিত। এই অবস্থায় জলদ-গম্ভীর স্বরে তাঁর শ্রীমুখে উচ্চারিত হত পরম ভাগবত বাণীর উচ্ছ্বাস। এই বাণীগুলিই ভাববাণী-শীর্ষকে পরিচিত। এই বাণী-নির্ঝরের কিছু অনুলিখিত ও সংকলিত হয়ে রয়েছে 'পুণ্য-পুঁথি' গন্থে। এই বাণীগুলির কোনও রকম দায়িত্ব রক্তমাংসসঙ্কুল শ্রীশ্রীঠাকুর গ্রহণ করেননি। এর কারণ, শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখ নিঃসৃত হলেও, এই বাণী 'ভাবের চরমে আমি পৃথক অবস্থায়' পরম কারণ সত্তার কথিত বাণী। 'পুণ্য-পুঁথি' অনুকূল সাহিত্যে এবং সমগ্র বিশ্বের ভাগবত ধর্মীয় সাহিত্যেই এক অত্যুজ্জ্বল রত্ন।

সুবিশাল অনুকূল সাহিত্য থেকে আমরা কি পেলাম? শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সমগ্র বাণী সাহিত্যের মধ্যে আমরা পাই, ধ্বন্তাপহ অপরোক্ষ সত্যসন্ধান, আমাদের চলার পথে অভ্রান্ত বাস্তব নিশানা, জগৎ ও জীবনের যাবতীয় প্রশ্নের সর্বপরিপূরণী সুসমন্বয়ী মীমাংসা, মানুষের ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের যাবতীয় সমস্যার বাস্তব মৌলিক সমাধান, মানব সন্ধিৎসার যাবতীয় বিষয়ে যুগানুগ একানুধ্যায়ী আপুরণী বিবর্তন সম্বেগী পুরশ্চরণী বিধি বিধায়না। আমরা পাই শান্তি-সান্তনা-অনুপ্রেরণায় উচ্ছ্বসিত পরমভাগবত এক সাহিত্য– যা বজ্রের মতো সত্য-দৃঢ় ও বলিষ্ঠ হয়েও কান্তার মতো প্রেম ও করুণায় সিঞ্চিত। এক কথায় বলতে গেলে, সমগ্র অনুকূল সাহিত্য সত্ত্বা সম্বর্ধনার অমোঘ দিগদেশনা। মানুষ ও মানব পরিবেশের উদ্ধর্ধন এবং সবৈশিষ্ট্য সমষ্টি উৎসারণাই অনুকূল সাহিত্যের এক ও অদ্বিতীয় বিষয়, লক্ষ্য ও উপজীব্য। অনুকুল সাহিত্যের বিষয়সূচীতে তাই স্থান পেয়েছে প্রতিটি মানুষের সপরিবেশ জীবন বৃদ্ধির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও প্রাসঙ্গিক সব কিছুই -ধর্মনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, বিচার শাসন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষানীতি, বিজ্ঞান, চিকিৎসা---। কিছুই বাদ পড়েনি শ্রীশ্রীঠাকুরের বিধি বিন্যাস থেকে।

বিষয়বস্তু এবং প্রকাশ শৈলী ও আঙ্গিক অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ উভয় দিক থেকেই অনুকুল সাহিত্যের সুনিষ্ঠ সমালোচনা, সমীক্ষা ও মূল্যায়ন অদ্যাপি উপেক্ষিত। হয়তো তা যুগান্তের অপেক্ষায় কাল গুণছে। কিন্তু একটি প্রশ্ন এই প্রসঙ্গে আমাদের আকৃষ্ট করে। এই সুবিশাল অনুকূল সাহিত্যের যিনি স্রষ্টা,

অর্থাৎ বর্তমান যুগপুরুষোত্তম শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকুলচন্দ্র, তিনি কি একজন সাহিত্যিক মাত্র? অর্থাৎ সাহিত্য রচনাই কি শ্রীশ্রীঠাকুরের সারাটা জীবনের একমাত্র বা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল?

এই প্রশ্নের উত্তর, বোধ করি, জোরালো ভাবেই 'না' । কোনও বিষয়ে কোনও দিন পড়ে শিখে বুঝে, বিচার বিতর্ক বিমর্ষ চিন্তা করে আপ্ত ও প্রাপ্ত জ্ঞান খাটিয়ে বা বুদ্ধি করে কোনও কথা শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন না । প্রত্যক্ষ দৃষ্টি, জ্ঞান, অনুভূতিকেই তিনি তাঁর ভাষায় প্রকাশ করতেন । প্রমা, প্রমেয়, প্রমাণ সেখানে এক । জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় সেখানে এক । এমনই এক 'অপৌরুষের' অক্ষর পরমভাগবত সাহিত্য অনুকূল-সাহিত্য । তাই অনুকূলচন্দ্র কোনও দিনই এই সাহিত্যর 'স্রষ্টা' বলে নিজেকে দাবি করেননি । কথা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন বলছেন; "এগুলি (বাণীগুলি) আমার কাছে যেমনভাবে এসেছে তাই আমি বলেছি । এছাড়া আর আমার কোন উপায় ছিল না । আমি বুদ্ধি করে কিছু বলিনি । আমি যদি লেখাপড়া জানতাম তাহলে আমার আর এ originality (মৌলিকত্ব) থাকত না । এখন এ কথাগুলি ল্যাংটা হয়েছে । আমার কোন অধিকার এর উপর নেই ।" (দীপরক্ষী, ৩য় খণ্ড, ২৭/১/১৯৫৭) । এমন কথা ঠাকুর বহু বহুবার বলেছেন ।

অতএব, বিষয়বস্তুর ঐশ্বর্য, আঙ্গিকের স্বকীয়তা এবং সকল প্রকার বৈশিষ্ট্য নিয়েও অনুকূল-সাহিত্যের সচেতন স্রষ্টারূপে শ্রীশ্রীঠাকুর কোনও দিন নিজেকে পরিচিত করেননি । যদিও অনুকূল-সাহিত্যাশ্রিত বক্তব্যের স্বীয় প্রত্যক্ষ অনুভূতিলব্ধ যাথার্থ্যকে নিশ্চয়াত্মিক স্বীকার করা থেকে তিনি কোনও দিন পিছ-পাও হননি । গীতা, বাইবেল, কোরআন, অনুকূল-সাহিত্য ইত্যাদি পুরুষোত্তম সাহিত্যের একটি অন্তর্গূঢ় চরিত্র বৈশিষ্ট্য বোধ হয় এটি । তথাগত, তদ্বার্তিক, যুগানুগ-পরিমিত প্রকাশে পরম কারণ ঈশ্বরের পবিত্র সাকার নারায়ণের বাণী সাহিত্যের এই বিশেষ গোত্র-পরিচিতি সবিশেষ অনুধ্যেয় ।

বস্তুত সাহিত্য-সৃষ্টি শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের প্রধান লক্ষ্য আদপেই ছিল না । তাঁর মহাজীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল-মানুষের সপরিবেশ সর্বাঙ্গীন সর্বপরিপুরণী অস্তি ও বৃদ্ধি । এই লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করতে তিনি বিশাল গণপ্লাবী লোকহিতযজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন বহুধাধাবিত সহস্রশীর্ষ ধর্ম আন্দোলনের ব্যাপনায় । এই বিশাল হবনায় যে মন্ত্র উদ্গীত হয়েছিল তা-ই অনুকূল-সাহিত্য । নিজ পরিসরে পরম গুরুত্বের অধিকারী হয়েও, অনুকূল-সাহিত্য অনুকূল-জীবনের একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্র ।

অনুকূল-সাহিত্যের সার্থক অধিগমনে সামগ্রিক অনুকূল জীবন ও জীবনবেদের অনুধ্যান অপরিহার্য । তাই শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন, "---মহৎ হয়ে থাকুন আদর্শ -পুরুষ, আর, তিনি চিরদিন তাঁর বাণী ভিতর দিয়ে তোমার জীবন চলনার নিয়ামত হয়ে থাকুন, ঐ বাদ বা বাণীই হোক তোমার পাথেয়, তঁদনুগ অনুশীলনা সম্বল হো'ক তোমার, কল্যাণের অঢেল উৎস হয়ে থাকুন তিনি-তোমার অন্তর দ্যুতিতে ।" (আদর্শ বিনায়ক, ১৩৭) ।

পরিশেষে শ্রদ্ধেয় ব্রজগোপাল দত্তরায়-প্রণীত জীবন চরিত্র 'শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র' (দ্বিতীয় খন্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়)-এর সম্পাদকীয় -সন্নিবেশে গ্রন্থের সম্পাদক শ্রদ্ধেয় রজতবরণ দত্তরায় কর্তৃক উত্থাপিত একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ উদ্ধৃত করে অনুকূল-সাহিত্য-সম্বন্ধীয় এই তন্বী আলোচনার ইতি টানছি ।

"---আমাদের একটা সাধারণ ধারণা আছে যে, -সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা সত্যের প্রবক্তা হলেও প্রচারক নন, তাঁরা মিতভাষী । আমাদের আরও একটা ধারণা আছে যে, -যাঁরা মুখর তাঁদের ব্যক্তিত্বের গভীরতা কম । এটা সাধারণ নিয়ম হলেও, তার একটা বিরাট ব্যতিক্রম ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র । তিনি সত্যদ্রষ্টা কিন্তু অমিতবাক্ । তিনি মুখর, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের গভীরতা অগাধ । অথবা বলা যায়, তাঁর চিদ্ঘনগ্রহণ নৈঃশব্দ্যের হিমাদ্রিবক্ষ ভেদ করে অবিরলস্রোতা কলনাদিনী বাণী-ভাগীরথীর চিরপ্রবাহ, অতলান্ত গাম্ভীর্যের মহাসিন্ধুর বুকে, জীবকূলের বেদনানিল সংস্পর্শে নিত্য-উচ্ছ্বসিত কথার ঊর্মিমালা । তাই তো দেখেছি তাঁর সমস্ত মুখরতার মধ্যেও অতলস্পর্শী একটা দুরবগাহ ভীষণ নিঃস্তব্ধতা, তাঁর সেই নিঃস্তব্ধতার মধ্যেও বাণী-মন্দাকিনীর কলনিঃস্বন ।

প্রশ্ন জাগে-তাঁর যত কথা সবই কি তাঁর সব কথা? তিনি কি নিঃশেষে উজার করে দিয়ে যেতে পেরেছেন তাঁর সবটুকুকে? বোধ হয়, না । জনৈকা ভক্ত মহিলা একদিন ঠাকুরকে বলতে শুনেছিলেন-'হীরার ব্যবসা করতে এসে জিরার ব্যবসা করলাম ।' কথাটা হয়তো সেই 'না'-এরই ইঙ্গিত । মহাপুরুষেরা স্বভাবতই মিতবাক । যোগ্য ভাবের সংঘাতেই তাঁদের ভাবভূমিতে যে আন্দোলন সৃষ্টি হয়, তা থেকেই স্ফূরিত হয়ে ক্ষরিত হয়ে পড়ে তাঁদের বাণীনির্ঝর । পার্থের ভাবসংঘাতেই পার্থসারথির কণ্ঠে ভগবদ্গীতার জন্ম । ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের কণ্ঠেও তেমনি অজস্র কথার উদগম-শত শত আর্তের ও অগণিত জিজ্ঞাসুর ব্যথা ও প্রশ্নের সংঘাতে । সমীচীন সাড়া বা সংঘাতের অভাবে আরও কত তথ্য, কত জ্ঞান-বিজ্ঞান, কত গভীর গুহ্য তত্ত্ব হয়তো বা অনুদগতই রয়ে গেছে ।"

তবে, অনুকূল-সাহিত্যে কী পাওয়া হয়তো বা বাকি রয়ে গেল, তার হিসাব মেলাতে মন মোর নহে রাজি । যা পেয়েছি, যুগপ্রেক্ষণায় তার মূল্যই যে অসীম । শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা স্মরণ করি-"বাকি নেই আর কিছুই । আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত কওয়া আছে একেবারে ।" (দীপরক্ষী, ১৮/৮/১৯৬০) ।

যে সদন সেই ভবন আর যে নাশন সেই সাদন; এখানে শুধু একটি আকার (আ) জুড়ে দিলেই বিপত্তি ঘটে । কিন্তু

চিরঞ্জীব বনৌষধি

(১ম খণ্ড)

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী শ্রীশিবকালী ভট্টাচার্য্য

রক্তচন্দন

অবসাদনের অর্থ হয় পরিষ্কার, এমনিভাবে শব্দ-সংকোচন, শব্দ-প্রসারণ করার মধ্যে আছে বর্ণবিন্যাসে ভাবান্তর সৃষ্টি, তাই প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি, ভারতীয় সংস্কৃতিতে বক্তব্য প্রকাশের ক্ষেত্রে শব্দ যোজনাই তার অপূর্ব রূপসৃষ্টি । এর দ্বারা বাস্তব জগতের উদ্ভূত অনুদ্ভূত যে কোন মানসচিন্তার ও দ্রব্যের স্বরূপ প্রকাশ করার ধী-শক্তি এরই মধ্যে নিহিত করার রীতি । যেমন-আহার, প্রহার, বিহার, সংহার শব্দের দ্বারা বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করা হয়-এক একটি উপসর্গের (প্র-পরা প্রভৃতি) মাধ্যমে তেমনি শব্দ-যোজনার আর একটি ভাষা 'প্রসাদন' । প্রসিদ্ধ দ্রব্য রক্তচন্দন-এটি শোণিতের প্রসাদন করে অর্থাৎ প্রসন্নতা আনে বাহ্য ও আভ্যন্তরিক ।

প্রয়োগের ক্ষেত্রে রক্তচন্দনের কার্যকারিতাই তার প্রসাদন, এখানে অবসাদন অর্থে প্রসর বা পরিষ্কার বা প্রসন্নতা আনা; রক্তচন্দনের ক্ষেত্রে এই বিশেষণটির প্রয়োগের গূঢ় তাৎপর্যই হ'লো-রক্তের দোষকে নিরসন করে প্রসারিত করে ।

আর্য-চিকিৎসাশস্ত্রের চিন্তাধারা-

'যুনক্তি প্রাণিনাং প্রাণঃ শোণিতং হানু বর্ত্ততে' (চরক-চিকিৎসস্থান) অর্থাৎ প্রাণ হলো রক্তের অনুগামী, সেই রক্ত বিশুদ্ধ থাকলেই দেহের বল, বর্ণ ও স্বস্থতা বজায় থাকে । একেই বলে শোণিতের প্রসাদন । এই কার্যের সহায়কের অন্যতম বনৌষধি এই রক্তচন্দন । এটি বৈদিক ভেষজ হয়েও তবে পাশ্চাত্য (পাশ্চাতে আগত, তাই পাশ্চাত্য) বলা যায়-এটি ঋক, যজু ও সামে সন্ধান পাওয়া যায়নি । বেদত্রয়ের ঢের পরে অথর্ববেদের বৈদ্যক কল্পে এবং অন্যান্য কল্পেও এটির সন্ধান আছে, সেখানে বলা হয়েছে-'কুসীদং যো নিষদনং পর্ণে বসতিস্কৃতা ।

যোনিং ইং কিলাসং অথবত্ত-সনবথ জ্বলনম্ ॥

(বৈদ্যককল্প ১৩/৩৯/১৩০ সূক্ত)

মহীধর ভাষ্যে বলা হয়েছে-

'কুসীদং=রক্তচন্দনং । বো যুষ্মাকং নিষদনং=স্থানং, যোনিং, কিলাসং=কুষ্ঠ, পর্ণে=পলাশে বসতিষ্কৃতা সনবথ জ্বলনং চইৎ=দাহাগ্নিং প্রশময়সি ।'

এই ভাষ্যটির অর্থ হলো- যোনির ক্ষত ও কুষ্ঠ, গাত্রকুষ্ঠ এবং দাহের বসতিস্থলে (চর্মে) রক্তচন্দন বসতি করুক । তার পত্রেও সর্বদা অগ্নির বাস রয়েছে অর্থাৎ তার পাতাগুলিও ঐসব স্থানে দাহ প্রশমন করে ।

অথর্ববেদের এই ইঙ্গিতটুকু সম্বল করে বিভিন্ন পদ্ধতিতে রোগ-প্রশমনে, অলঙ্করণে ও দেহরঞ্জনে তাকে কাজে লাগিয়েছেন মনীষীগণ । চরক-সুশ্রুতাদিতে বৈদিক সূক্ত থেকে তারা ইঙ্গিত পেয়েছিলেন তার নামকরণের মধ্যেই । বলা হয়েছে-কুসীদং অর্থাৎ কুৎসিত স্থানে তার কর্মক্ষেত্র এবং সে রোগ ক্ষেত্রটি কোথায় তারও একটা ইঙ্গিত বৈদিক সূক্তে আছে । অবশ্য এ সম্পর্কে আরও অনুশীলন করে তারা প্রয়োগ করেছেন রক্তপ্রদর, শ্বেতপ্রদর, কামজ উন্মাদ, কুষ্ঠ, বিসর্প ও বিভিন্ন রোগজ দাহের ক্ষেত্রে । এ ভিন্ন দেখা যায় যে, বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ রক্তচন্দনের তিলকের দ্বারা, বশীকরনের কাজ করতেন । আর সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রে প্রেমিকার প্রথম প্রণয়ের চিঠি লেখার রীতি বর্ণনা করা আছে, সেটির অক্ষর পদ্মফুলের পাপড়িতে রক্তচন্দনে লেখা হতো । বাল্মীকির রামায়ণে উল্লেখ আছে-"গ্রীষ্মকালে শ্রীরামচন্দ্রের দেহে রক্তচন্দন মাখানো হতো, দেহের দাহকে প্রশমন করার জন্যে" । এই দাহ প্রশমনের শীর্ষ দ্রব্য হিসাবেই কি সাধকগণ সূর্যার্ঘ্য দেওয়ার সময় রক্তচন্দনকে আবশ্যিক উপচার রূপে নির্ধারণ করেছিলেন?

কালে কালে নানা মুনির নানা মত-এ ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় হয়নি । অথর্ববেদে পাওয়া গেল রক্তচন্দন, আর প্রাক্ আর্য সংস্কৃতির অথবা দ্রাবিড় সভ্যতার কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছে শ্বেতচন্দন । কত শত বৎসর পার হয়ে আসার পর ষোড়শ বা সপ্তদশ শতকে এসে দেখা যাচ্ছে কেমন এক জগা-খিচুড়ী পাকানোর কাল । ভাবপ্রকাশকার বললেন– শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, কালীয়ক (পীতচন্দন) এবং কুচন্দন (পত্তঙ্গ বা পত্রাঙ্গ) ; আর তার আগে পঞ্চদশ শতকের রাজনিঘন্টু নামীয় সংগ্রহ গ্রন্থে দেখা যাচ্ছে ছয় প্রকার চন্দনের নাম; কিন্তু পরম্পরায় পরিচিতির অভাবে আজ সব কয়টির পরিচিতি সমভাব নয় ।

কি পাওয়া যাচ্ছে-

১ । রক্তচন্দন (Pterocarpus santalinus Linn.f.) ফ্যামিলি Leguminosae.

২ । শ্বেতচন্দন ৯Santalum album Linn). ফ্যামিলি Santalaceae.

৩ । কুচন্দন-এদেশে একে রক্তকম্বল বলে, এর নাম Adenanthera pavonina Linn. ফ্যামিলি Leguminosae. আলোচ্য রক্তচন্দনের গাছ ২৫/৩০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয় । কাঠের সারাংশই ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় । এই গাছ সাধারণতঃ পাওয়া যায় দাক্ষিণাত্যের অঞ্চল বিশেষে । এতদঞ্চলে শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনেও একটি আছে ।

আসল-নকল –বাজারে নকল রক্তচন্দনের কাঠ আমার নজরে পড়েছে, এটি অন্য গাছের সারাংশ, তবে সবই নকল একথা বলছি না । সম্ভব হলে সরকার পরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠান

থেকে কিনলে ও ভয়টা থাকে না তা না হলে কোন বিশ্বস্ত দোকান থেকে সংগ্রহ করবেন ।

শোণিতের স্রুতি কোন্ পথে-

প্রথমেই বলি শোণিতেই প্রাণ, যদিও সর্বশরীরব্যাপী এর অবস্থানক্ষেত্র, তাহলেও এর বহির্গমন তখনই হয়, যখন শারীরক্রিয়া বিপর্যস্ত হয়ে যায় । এই নির্গমনের পথ প্রধানতঃ-চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখ, লোমকূপ, মল ও মূত্রের দ্বার । যদিও পিত্ত-প্রাধান্যেই এই বিকৃতি ঘটে, তাহলেও ত্বক্ বিদীর্ণ হয়েই (চামড়া ফেটে) রক্ত আসতে পারে । এর মূল সূত্র হচ্ছে-ক্ষয়ধর্মী হলেই দাহ থাকে, হলেই প্রতিষেধক এই রক্তচন্দন ।

সক্রিয় ভূমিকায়-

(১) প্রবল জ্বরের দাহে ঃ -অকৃত্রিম রক্তচন্দনের গুড়ো বা চেলি ১০/১২ গ্রাম এক পোয়া আন্দাজ গরম জলে ৩/৪ ঘন্টা ভিজিয়ে সেই জল অল্প মাত্রায় সমস্ত দিন খেলে দাহ ভাল হয়; গুড়োর অভাবে রক্তচন্দন ঘষে গরম জলে গুলে নিলেও চলে ।

(২) রক্ত প্রস্রাবের জ্বালায় ঃ- উপরিউক্ত পদ্ধতিতে রক্তচন্দনের জল তৈরি করে ২/৩ বার খেলে জ্বালা কমে যায় ও রক্ত পড়া বন্ধ হয় ।

(৩) রক্তপিত্তে ঃ- যেখানে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠছে, তার সঙ্গে শরীরের জ্বালাও আছে-এ ক্ষেত্রেও ঐ পদ্ধতিতে জল তৈরি করে খাওয়ালে গায়ের জ্বালা ও রক্তবমন নিশ্চিত প্রশমিত হবে । বৃদ্ধ বৈদ্যেরা এরই সঙ্গে ৪/৫ গ্রাম পাতা সমেত শালপানি (Desmodium gangeticum) গাছ থেতো করে ভিজিয়ে খেতে বলেন ।

(৪) অনিয়মিত রক্তস্রাবে ঃ- যাঁদের ঋতুধর্ম অনিয়মিত হয়-সে ক্ষেত্রে এই রক্ত চন্দন উপরিউক্ত মাত্রায় প্রস্তুত করে কিছুদিন খেলে স্বাভাবিক হয়ে যায় ।

(৫) নাক-কানের রক্তস্রাবেঃ- শরীরের এই দুটি দ্বার দিয়ে রক্ত ঝরতে থাকলে রক্তচন্দন সিদ্ধ বা ভিজানো জল খাওয়ার ব্যবস্থা আছে ।

(৬) চষিপোকা লাগায়ঃ- এটা সাধারণতঃ হাতে তালুতে হয় । এটাকে ক্ষুদ্র কুষ্ঠের মধ্যে ধরা হয়ে থাকে-এ ক্ষেত্রেও রক্তচন্দনের কাঠ সিদ্ধ করে সেই জল খেতে হয় এবং তার সঙ্গে রক্তচন্দন ঘষা হাতের তালুতে লাগাতে হয় ।

(৭) কর্ণমূলের শোথে (**Mumps**) :-এ রোগে আক্রান্ত হলে রক্তচন্দন ঘন করে ঘষে কর্ণমূলে লাগাতে হয়, এর দ্বারা ব্যথা, ফুলো ও জ্বালা তিনটিই কমে যায় ।

(৮) ঘামাচি শুকিয়ে চামড়া উঠে যাওয়ার মত সর্বাঙ্গে এক প্রকার রোগ হয় । বাংলার কোন কোন অঞ্চলে একে 'নুনছাল ওঠা' রোগ বলে । এ ক্ষেত্রে রক্তচন্দন ঘষে গায়ে লাগালে ওটা সেরে যায় ।

(৯) দাদে (Ringworm) :- এ রোগের প্রথমাবস্থায় রক্তচন্দন ঘষে লাগালে প্রায় ক্ষেত্রেই সেরে যায় ।

(১০) বাতরক্তে :- যেসব ক্ষেত্রে কোন আঘাত না লেগে গায়ে লাল দাগ হয়, অনেকের আবার এর সঙ্গে ওগুলিতে একটু ফুলো ও চুলকানি থাকে, সেখানে এই কাঠ ঘষে লাগালে এটা উপশম হয় ।

(১১) দাঁতের মাড়ির রক্ত পড়ায় :- এই কাঠসিদ্ধ জল দিয়ে কুলকুচো করলে বন্ধ হয় । এমন কি ঘুমালে যাঁদের মাড়ি থেকে রক্ত পড়ে, এর দ্বারা তাঁরাও নিষ্কৃতি পাবেন ।

(১২) মাথার যন্ত্রণায় ঃ- এই যন্ত্রণা যদি কোন বিশিষ্ট কারণে না হয়, তাহলে এই কাঠ ঘষে কপালে লাগালে কমে যায় ।

(১৩) স্তনের ফোড়ায় (একে আমরা ঠুনকোও বলি):- এ ক্ষেত্রে এই কাঠ ঘষা (ঘন করে) দিনে-রাতে ৩/৪ বার লাগাতে হয় ।

(১৪) বিষ ফোড়ায়:- ঘষা রক্তচন্দন ও গোলমরিচ ঘষে ফোড়ায় লাগালে এক দিনেই বিষুনি কেটে যায় ।

(১৫) দুষিত ঘায়ে (ক্ষতে) :- রক্তচন্দনের কাথ দিয়ে ধুলে ক্ষতের দোষ কেটে যায় ।

এ ভিন্ন কোন দোষের জন্য রক্ত সম্পর্কে কোন রোগের সৃষ্টি হয়েছে, বিচার করতে পারলে এর দ্বারা বহু রোগেরই উপশম হতে পারে ।

সাহিত্যিকদের যদি টি আর পি ধরা হয়, তাহলে এই মুহূর্তে

দৃষ্টি আকর্ষণ

সন্দীপনার চলার পথকে সাবলীল করার জন্য আপনার বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করুন । সেই সাথে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞাপন দিয়ে সন্দীপনার কলেবর বৃদ্ধিতে সহায়তা করুন ।

সৎসঙ্গ সংবাদ প্রেরণকারী/ লেখকবৃন্দের প্রতি সবিনয় অনুরোধ-পরিচ্ছন্ন কাগজের একপাশে স্পষ্টাক্ষরে লেখা হওয়া বাঞ্ছনীয় ।

-সম্পাদক

বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রীশীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার

ঈশ্বরবাদই জীবনকে সমৃদ্ধ করতে পারে

হয়তো আপনার টিআরপি সবচেয়ে বেশি । আপনার প্রথম উপন্যাসের কথা আজ কীভাবে স্মৃতিতে ভর করে?

আমার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'ঘুণপোকা' । কিন্তু 'ঘুণপোকা' প্রথমে পাঠকের সমাদর লাভ করেনি । 'ঘুনপোকা'র মোমেন্টাম তৈরি হতে সময় লেগেছে । প্রথমে অনেকেই পড়েননি 'ঘুণপোকা' । ১৯৬৭ সলের পুজো সংখ্যায় বেরনোর পর ফিড ব্যাকটা খুব পুয়োর ছিল । আমি তখন খুব হতাশ হয়েছিলাম । জীবনে প্রথম একটা উপন্যাস লিখলাম । অথচ পাঠক সেখানে নিল না ধীরে ধীরে ঘুণপোকা পরবর্তীকালের পাঠককে প্রভাবিত করতে পেরেছে । আজ ঘুনপোকার বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি । এখন অনেক বিক্রি হয় ঘুণপোকা ।

আপনার লেখা প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল কবে থেকে?

আমি ১৯৫৯ সাল থেকে দেশ পত্রিকায় লিখি । তারপর পুজো সংখ্যায় লেখা, নানা ছোট গল্প লেখা তো চলতই । দেশ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত গল্পের নাম ছিল জলতরঙ্গ ।

আপনার পেশাগত জীবন শুরু হয়েছিল শিক্ষকতা দিয়ে, গৃহশিক্ষকতাও কি এই পেশার অন্তর্ভূক্ত ছিল?

না । আমি গৃহশিক্ষকতা কোনদিনই করিনি । আমি প্রাইভেট টিউশনটা সহ্য করতে পারি না । পড়ানো কাজটা আমার ভাল লাগত না । স্কুলে পড়াতাম জীবিকার তাগিদে ।

স্কুলের চাকরী ছাড়লেন কবে?

১৯৭৬ সালে খবরের কাগজে যোগ দিলাম । তখনই ছেড়ে দিই স্কুলের চাকরি । আসলে সাংবাদিকতার চাকরিটাকে আমি ভীষণ ভালবেসেছিলাম । সাংবাকিতা আমার সামনে একটা দিগন্ত খুলে দিয়েছিল ।

সাংবাদিকতার চাকরি পাওয়ার জন্য কি পরীক্ষা দিয়েছিলেন?

না, না । আমাকে ডেকে চাকরি দেওয়া হয়েছিল । আমি কোনও দিনই উমেদার হয়ে কারও কাছে গিয়ে কিছু বলতে পারিনি নিজের জন্য । কাগজের অফিস থেকে বলা, সে সময় খবরের সেন্সর চলছে । ফলে পত্রিকায় অনেক ফাঁকা জায়গা পড়ে থাকছে । সেই সব জায়গা ভাল ফিচার দিয়ে ভরতে হবে । তাই তাঁদের নতুন রক্ত চাই । তখন আমি সাব এডিটর হিসেবে জয়েন করলেও লিখতাম ফিচার । ওই সময় আমার লেখা ফিচারগুলো খুব জনপ্রিয়ও হয়েছিল ।

আপনার সাংবাদিকতার জীবনে যাঁদের সঙ্গে কাজ করেছেন, তাঁরাও তো বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন ।

হ্যাঁ, তা তো বটেই । শ্যামল গাঙ্গুলি, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, অমিতাভ চৌধুরি, সাগরময় ঘোষ, সিরাজ সকলের সঙ্গে কাজ করেছি । তবে সাংবাদিকতার চাকরি করার আগে থেকেই এদের সকলের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল ।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-এর সঙ্গে আপনার বন্ধুতার জায়গাটা কেমন ছিল?

সুনীলের জীবনযাত্রার থেকে আমার জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের । ফলে আড্ডায় যে খুব একটা বসেছি তা নয় । তবে ট্যুর যেতাম একসঙ্গে । আমি আর সুনীল কলিগ ছিলাম । দীর্ঘদিন পাশাপাশি বসে কাজ করতাম আমরা । পরস্পরের কাছাকাছি ছিলাম অনেকটাই । কফি হাউসেও অনেক আড্ডা হয়েছে । আমি আর সুনীল যে এক টেবিলেই বসতাম সব সময় তা নয় । একটু বিভাজন ছিল । কবিরা আলাদা বসতেন আর লেখকরা আলাদা বসতেন । সুনীলের আলাদা সেট অফ ফ্রেন্ডস ছিল । আমারও আলাদা সেট অফ ফ্রেন্ডস ছিল । তারপর অনেক সময় অফিসে নির্জন-বিরলে বসে অনেক কথা হতো । ও খুব একটা বেশি কথা বলত না । কখনও কখনও দু-একটা সমস্যা নিয়ে কথা হতো । ছাত্র অবস্থা থেকেই তো ওঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব, শ্রদ্ধাবোধ, ভালবাসা ছিল । আর এই তো সেদিন চলে গেল সুনীল ।

শক্তি-সুনীলের বোহেমিয়ান জীবনযাত্রা নিয়ে তো প্রচুর জল্পনা আছে । কিন্তু আপনার ব্যক্তিজীবন চর্চা নিয়ে তো সেরকম কোনও চর্চা নেই । নিজের এই ইমেজটা কি আপনি সচেতনভাবেই তৈরি করেছেন?

আমার জীবনযাত্রা শক্তি-সুনীলের থেকে একদম আলাদা । কারণ ১৯৬৫ সালে আমি অনুকূল ঠাকুরের দীক্ষা গ্রহণ করি । তারপর থেকে আমার জীবনচর্চায় পরিবর্তন আসে । তার আগে আমি যে পান ভোজনে একেবারে আসক্ত ছিলাম না তা কিন্তু নয় । একটু পান আমিও করতাম । তখন পয়সা ছিল না আমার কাছে বেশি । তাই হয়তো পানেও টান পড়ত । কিন্তু ৬৫ সালে ঠাকুরের আশ্রয়ে আসার পর আমার জীবনে সংযম আসে । তার ফলে কিন্তু আমার সঙ্গে শক্তি-সুনীলের সম্পর্কের কোনও পরিবর্তন হয়নি । কারণ ওঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখতে গেলে মদ্যপানটা কোনও শর্ত ছিল না । লেখালেখির জগতের বন্ধুত্বটা অনেক গাঢ় ছিল আমাদের মধ্যে ।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তো আপনার জীবনের একটা বড় সময় কেটেছে। সেই অনুভূতি আজও কতটা জীবন্ত?

ভীষণভাবে বেঁচে আছে এই বন্ধুত্বটা আমার মধ্যে। শক্তি ছিল বোহেমিয়ান। বাড়ি থেকে হুটহাট বেরিয়ে যেত। শক্তিকে তো পাওয়াই যেত না। আজ উত্তর ভারত, কাল আসামে, পরশু কাছাড়ে শক্তি ঘুরে বেড়াত। আবার কলকাতায় ফিরলে আসত আমার বাড়িতে। দেখা হতো তখন। আমি যে মেসে থাকতাম সেখানেও যে, আড্ডা-হুল্লোরও হতো খুব। অনেক অত্যাচারও সহ্য করেছি শক্তির (স্নেহ স্পষ্ট)। যাই হোক শক্তিকে আমি খুব ভালবাসতাম। তুই-তোকারির সম্পর্ক ছিল আমাদের, শক্তি খুব শক্তিশালী কবি ছিল। কিন্তু এত মদ খেত, এত অনাচার করত নিজের শরীরের ওপরে, অথচ কবিতা যখন লিখত মনে হতো শুদ্ধ সন্ন্যাসী বেরিয়ে আসছে। এত ম্যাজিক ছিল শক্তির হাতে, যা ভাবা যায় না।

আপনি ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন কেন? কোনও বিশেষ ঘটনা কি এর পেছনে কাজ করেছিল?

আমার জীবনের একটা হতাশার জায়গা থেকে ঠাকুরের স্মরণে গিয়েছিলাম। আমার কাছের ঠাকুর বইতে সেই সব কথা বলেছি। আমার জীবনে সবচেয়ে বড় ঘটনাই হল ঠাকুরের কাছে যাওয়া। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় নিয়ন্ত্রকও হলেন ঠাকুর।

কী ধরনের হতাশার কথা আপনি বলছেন?

সব ধরনের ডিপ্রেশন ছিল আমার জীবনে, একটা জিনগত হতাশা তো ছিলই আমার। এত অল্প কথায় আমার জীবনের ডিপ্রেশনের কাহিনী বলতে পারি না। তবে এটা বলি যে, সৃষ্টিতত্ত্ব ও মৃত্যু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা থেকেই আমার জীবনে হতাশা এসেছিল। এই তত্ত্ব থেকে কোনও মানুষেরই মুক্তি নেই কখনওই। আমি আত্মহত্যার চেষ্টাও করেছিলাম। সেই অবস্থা থেকে আমি ঠাকুরের কাছে যাই, ঠাকুরের সঙ্গে আমার জীবন পুরো জড়িয়ে গিয়েছে। আপনার লেখা একদিকে যেমন ছোটরা ভালবেসে পড়ে, অন্যদিকে বড়দেরও আপনার লেখাগুলো সমানভাবে আকর্ষণ করে। এর রহস্যটা কী?

আমি লেখাটা কোনওদিনই সচেতনভাবে লিখিনি। লেখার সময় মগ্ন হয়ে লিখি। কখনও প্ল্যান করে কিছু লিখিনা। আমি লিখতে বসে ভাবি। আর ভাবতে ভাবতে লিখি। এভাবেই আমার সব লেখা হয়েছে। শুধু জীবনকে নানাভাবে পরখ করে চিন্তা করেই আমার লেখা।

আর আপনার সৃষ্টি করা ভূত গুলো তো বাস্তব নয়। তাহলে তারা এল কীভাবে আপনার জীবনে?

এখানে সবটা বাস্তব খুঁজতে গেলে মুশকিল। তবে আমার ছেলেবেলা, চেনা জায়গা-এসবের টোপোগ্রাফি আছে আমার লেখায়। কিন্তু চেনা মানুষ, টুকরো-টাকরা মজা আর এসবের গ্যাপটা ইমজিনেশন দিয়ে পুরণ করি। এসব মিলেই একটা মজা তৈরি হয়ে যায়। এই আর কী।

আপনার লেখায় কাদের প্রভাব আছে বলে আপনি মনে করেন?

প্রত্যক্ষ প্রভাব কারও নেই। তবে অপ্রত্যক্ষ প্রভাব অনেকেরই আছে। যেমন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, জীবনানন্দ-সকলের কিছুটা তো প্রভাব আছেই। তবে সবটাই অপ্রত্যক্ষ প্রভাব।

রবীন্দ্রনাথকে আপনি জীবনে কীভাবে নিয়েছেন?

রবীন্দ্রনাথ আমার ভীষণ প্রিয় মানুষ। উনি তো এখন প্রায় ঈশ্বরের সমান হয়ে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে আমার যখন-তখন ভিক্ষের হাত পাতি। তিনি আমাদের পথ মসৃণ করে দিয়ে গিয়েছেন। আমাদের হাতে যে আধুনিক ভাষা এসেছে, সেটাও তো রবীন্দ্রনাথেরই সৃষ্টি। তিনি এই ভাষা আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে

সুখবর! সুখবর!! সুখবর!!!

আপনি কি নতুন লেখক? আপনার লেখা- গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও বিষয়ভিত্তিক সৃজনশীল লেখাগুলি প্রকাশ করতে আগ্রহী? তাহলে নিম্ন ঠিকানায় আজই যোগাযোগ করুন। আমরা শর্ত সাপেক্ষে আপনার লেখা ছাপার উপযোগী হলে অবশ্যই ছাপাবো।

এছাড়া নভেল, নাটক, অনুবাদগ্রন্থ, সিরিজ গ্রন্থ, সাধারণ জ্ঞানের বই, কোরআন, হাদীস ও অন্যান্য সকল ধরণের বই পাইকারী ও খুচরা বিক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

নিউজ কর্ণার পাবলিশিং
সিদ্দিকীয়া মিনি মার্কেট, আন্ডারগ্রাউন্ড
চাঁদনী বাজার, বগুড়া।

আমাদের ঋণের কোনও শেষ নেই।

আপনার লেখা নিয়ে এত ছবি বানানো হচ্ছে। কোথাও মনে হয়েছে যে আপনার লেখার বক্তব্যের সঙ্গে ছবির বক্তব্য আলাদা হয়ে গিয়েছে?

হ্যাঁ সে তো কতই হয়েছে। এটাই স্বাভাবিক। মাধ্যম আলাদা, বাচনভঙ্গি আলাদা হলে বক্তব্যের একটু এদিক-ওদিক তো হবেই। এখন সেটাই মেনে নিয়েছি। তবে কেউ কেউ ভাল করেও ফেলেন।

'গয়নার বাক্স' সিনেমার দুটো ভার্সানই দেখেছেন? মানে শেষ কুড়ি মিনিট এডিটেড ভার্সান ও নন-এডিটেড ভার্সান?

হ্যাঁ। সেটা তো প্রোডিউসাররা করেছেন। আমি ভেতরের খবর অত জানি না। তবে শুনেছি মফস্বলে কিছুটা বদলে দেওয়া হয়েছিল শেষটা।

সারা পৃথিবীতে এত ধর্ম হয়েছে। ধর্ম সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কী?

এটা জিজ্ঞাসা করে তো আমায় বিশাল সমুদ্রে ফেলে দিলে। (মুখে প্রশান্তির হাসি)। এই নিয়ে বলতে বসলে তো আবার সারা রাত কেটে যাবে। আমার মতে অস্তিত্ব এবং বৃদ্ধির ধর্মই হল আসল ধর্ম। আমাদের অস্তিত্ব আর বৃদ্ধির জন্য যা কিছু সাহায্য করে-সবই ধর্ম। ধর্ম এর বাইরে কিছু নয়।

কথায় বলে দেশকে চিনিলাম বিদেশে গিয়া। আপনি এত দেশ ঘুরেছেন। সেইসব দেশ দেখে নিজের দেশকে কোথায় রাখছেন?

অনেক পিছিয়ে। এখনও বহু দেশের থেকে ভারত অনেক পিছিয়ে। দোহার, কাতার-এর থেকেও ভারত অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে। আর এদেশে সেন্স অফ ডিসেনসির খুব অভাব। শৃঙ্খলার বোধহয় খুব অভাব। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বিষয়টাই নেই। খানিকটা অংশ ঝকঝকে। কিন্তু বাকিটা কী বীভৎস নোংরা। আবর্জনা। আর অনিয়ন্ত্রিত জন্ম– এত জন্ম এত লোকসংখ্যা হলে আর উন্নতি করবে কী করে? ভারতের জাতীয় আয় কিন্তু খুব কম নয়। কিন্তু সঠিক বন্টনের অভাবে এই হাল দেশটার। শক্ত হাতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ না করা গেলে, সমস্যা বাড়বে বই কমবে না।

আপনি অবসর যাপনের জন্য কোনও বিষয়কে পছন্দ করেন?

আমি চিন্তা করতে ভালবাসি। অবসর যাপনের জন্য আমি চিন্তা করতেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসি। তবে টিভি দেখি, খেলা দেখি, ছেলের সঙ্গে আড্ডা মারি, মেয়ে আছে, কেউ এলে তাঁদের সঙ্গে আড্ডা দিই। কখনও কোনও বন্ধুর বাড়ি যাই, তবে সে পরিমাণে কম। এভাবেই কাটছে আর কী?

এ প্রজন্মের লেখক-লেখিকাদের মধ্যে কাঁদের লেখা পড়েন? শ্রেষ্ঠ লেখক-লেখিকা কাকে মনে হয়?

এভাবে বলাটা মুশকিল। লেখালেখির জগতে শ্রেষ্ঠত্বের বিচার করা মুশকিল। আমার মনে হয় এ প্রজন্মের যারা লিখছেন তারা সবাই খুব প্রমিসিং এবং ভাল লিখছে। উল্লাস, মল্লিক, প্রচেত গুপ্ত, সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, কাবেরী রায় চৌধুরি, কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় আরও অনেকে আছেন।

ঋতুপর্ণ ঘোষকে এতদিন এত কাছ থেকে দেখেছেন স্নেহ করেছেন। সাহিত্যিক ঋতুপর্ণকে আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

আমি আহত হয়েছি। ঋতুপর্ণ একজন বড় মাপের সাহিত্যিক ছিল। ওঁর লেখালেখি খুব ভাল ছিল। সিনেমা করিয়ে না হলেও খুব বড় সাহিত্যিক হতে পারত। সিনেমা করতে গিয়ে লেখা বন্ধ করে দিল। সত্যজিৎ রায় কিন্তু লেখা আর সিনেমা এক সঙ্গে চালিয়েছিলেন। ঋতু করেনি। ওর কিছুটা আলসেমিও ছিল। সিনেমা করেই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। লেখা বন্ধ করে দিল। লেখায় হাত ছিল ঋতুর খুব ভাল।

আর মানুষ ঋতুপর্ণ ঘোষ এর ব্যাখ্যা আপনার কাছে কী? নারীর শরীর পেতে ঋতুপর্ণ ঘোষ এর এত প্রচেষ্টাকে আপনি সমর্থন করবেন?

ও খুব ভাল মনের মানুষ ছিল। অত ভাল মানুষ পাওয়া যায় না আজকাল। আর ঋতুর মন-শরীর নিয়ে এত লেখালেখি হচ্ছে -আসলে একটা মানুষের মনের যন্ত্রণাটা তো বুঝতে হবে। আইডেনটিটি ক্রাইসিস কী যন্ত্রণা সেটা যাঁর হয়েছে সেই বুঝবে। ঋতু শরীরে পুরুষ হলেও মনে নারী ছিল। তাই ঋতু বলতো আমি মেয়ের মন নিয়ে পুরুষ শরীরে আটকা পড়ে আছি। ঋতুর যন্ত্রণা যখন আমি অনুধাবন করি, তখন আমার চোখে জল চলে আসে। হি ওয়াজ ট্র্যাপড ইন আ জেনেটিক প্রবলেম। অনেকেই এটা জানেন না। বোঝেন না। বোঝার চেষ্টাও করেন না। অল্প বয়সে ঋতু যখন এসেছিল তখন ও ছিল একটা গোলগাল চেহারার ছেলে। ঝকঝকে চোখ, বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা শক্তিশালী লেখনী। তখন এই আইডেনটিটি ক্রাইসিস্ট ওঁর ছিল না। এত ট্যালেন্টেড হওয়া সত্ত্বেও ঋতু যে কষ্ট পেয়েছিল সেটা ভাবলে আমার খুব কষ্ট হয় ঋতুর জন্য।

আপনার কাছে মৃত্যুর আবেদন কী রকম?

মৃত্যুর কোনও ব্যাখ্যা হয় না। মৃত্যুতেই সমাপ্তি বলে আমি বিশ্বাস করি না। আমি জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী।

বর্তমান সময়ের অস্থিরতা সন্ত্রাসবাদ, অসহিষ্ণুতার মতো ব্যাধির কী ওষুধ হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

আধ্যাত্মিকতা মানুষকে শান্তি দিতে পারে। যুগ যুগ ধরে দেখা গেছে ঈশ্বরবাদই জীবনকে সমৃদ্ধ করতে পারে। বর্তমান সময়ের অস্থিরতাও শান্ত করতে পারে। আধ্যাত্মিকতা, নান্য পন্থা বিদ্যতে----। বিজ্ঞান দর্শন কিছুই শান্তি দিতে পারে না। ঠিকঠাক ঈশ্বর সাধনাই পারে মনে শান্তি দিতে।

'যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতিধ্রুবা নীতিমতির্মম'।

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ

ড. প্রজ্ঞারঞ্জন দত্ত, বিদ্যাবাচস্পতি

-গীতা ১৮/৭৮

–'যে পক্ষে যোগেশ্বর কৃষ্ণ এবং যেখানে ধনুর্ধর পার্থ (অর্জুন), সেখানেই লক্ষ্মী, বিজয়, উত্তরোত্তর ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি এবং অখণ্ড রাজনীতি আছে, ইহাই আমার মত ।

এখানে 'যোগ শব্দের অর্থ–উপায়, কৌশল এবং যুক্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । যিনি যোগের ঈশ্বর অর্থাৎ অপূর্ব কৌশলী । 'যোগেশ্বর' এবং 'ধনুর্ধর' বিশেষণ দু'টো বিশেষভাবে লক্ষণীয় । যুক্তি এবং শক্তির সমন্বয়ের দ্বারাই কার্যের সফলতা সম্ভবপর, কেবলমাত্র বল এবং বুদ্ধির দ্বারা ইপ্সিত ফলাফল সম্ভবপর নয় । আবার, 'যোগ' শব্দের অর্থ সম্বন্ধ এরূপও বলা যেতে পারে । ভগবানের সঙ্গে জীবের যোগ বা সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ার পথ মোটামুটিভাবে তিনটিই প্রসিদ্ধি বলে স্বীকৃত । সেইজন্য গীতাতে তিনটে কান্ডের পরিচয় পাওয়া যায় । ১৮টি অধ্যায়ের প্রথম ছয়টি (১-৬) কর্মকান্ড, পরবর্তী ছয়টি (৭-১২) অধ্যায় উপাসনাকান্ড বা ভক্তিকান্ড এবং শেষ ছয়টি (১৩-১৮) অধ্যায় জ্ঞানকান্ড । গীতায় মোট আঠারোটি যোগ থাকলেও মুখ্যযোগ হ'ল তিনটে-কর্মযোগ, ভক্তি যোগ এবং জ্ঞানযোগ । ভগবানের সঙ্গে জীবের যোগ বা সম্বন্ধ এই তিনভাবেই হতে পারে । যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত উদ্ধবকে মানুষের কল্যাণের জন্য জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি এই তিন প্রকার যোগের কথাই বলেছেন, এ ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই, (ভাগবত, ১১/২০/৬) । জ্ঞান মানে তাঁকে জানা, ভক্তি মানে তাঁকে ভালবাসা এবং কর্ম মানে তাঁর উদ্দেশ্য কিছু করা । যাঁকে জানি না, তাঁকে ভালবাসতে পারি না, সুতরাং তাঁর উদ্দেশ্যে কিছু কর্ম করাও হয়ে ওঠে না ।

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম-যথাক্রমে মাটি, জল, আগুন, বাতাস ও আকাশ; এই পাঁচটি ক্রম অতিক্রম করে ক্রমশঃ সকলকে সুক্ষ্ম তত্ত্বে উঠতে হয় । পাঞ্চভৌতিক দেহবিধানে মাটি এবং জলের গুরুত্ব অপরিসীম । অধ্যাত্মপথের পথিক যারা তারা সাধনার দ্বারা এক সুক্ষ্ম দেশের দর্শন পান । সে দেশে মাটি ও জল দেখা যায় না, কেবল মাত্র তেজ, বায়ু এবং ব্যোমের দ্বারা সে -দেশ গঠিত । সে -দেশকে বলে চিন্ময় দেশ বা ব্রহ্মলোক অথবা দেবলোক, যেখানে মানুষের অন্তরাত্মা ব্যাপ্তি লাভ ক'রে দীপ্ত হয় । এই অবস্থাপ্রাপ্তি এজীবনেই সম্ভব; জড়দেহে বীতরাগ হলে দেবলোকে অনুরাগ আসে । অনিমা, লঘিমা, গরিমা, প্রকাম্য এবং মহিমাদি গুণাবলী অতি সহজেই করায়াত্ত হয় । প্রাণ বলে বাতাসকে । প্রাণবায়ু সার্থকতা লাভ করে শ্বাসে । বাতাস স্থির হলে তাকে বলে আকাশ । আকাশ হল মহাশূন্য । মহাশূন্য চৈতন্য পরিপূর্ণ । সেই ব্রহ্মচৈতন্য জিনিষটি চিন্তামনি মণির মত । তখন সাধকের বোধ হয়, আমি দেহ নই; দেহ তো হাড় মাংস । আমি শ্বাস, চৈতন্যরূপে সর্বত্র বিচরণ করছি–'শ্বাসে বাতাসে অনন্ত আকাশে' । শ্বাস মেশে বাতাসে, বাতাস মেশে আকাশে । প্রাণবায়ু শ্বাসরূপে পরমচৈতন্যের প্রতীকরূপে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত । প্রাণবায়ু নাসাপথ ত্যাগ করলে ঐ চৈতন্যও আমাদের ছেড়ে চলে যায় । শ্বাসে মন স্থির করতে পারলে তবেই শান্তি পাওয়া যায় । সেই জন্যই ত যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবৎসলদের অভয়বাণী দিয়েছেন, -

'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদযাজী মাং নমস্কুরু!
মামৈবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে!!
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।' ----ইত্যাদি

-গীতা ১৮/৬৫,৬৬

–'আমাতে নিবিষ্ট-চিত্ত হও, আমার ভক্ত ও আমার পূজক হও, আমাকে নমস্কার কর, একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সকল পাপ থেকে বিমুক্ত করব ।

বাড়ী তৈরি করতে গেলে প্রয়োজনানুসারে ভিতের প্রয়োজন উপলব্ধ হয় । আধাত্মিক জগতেও সম্যকভাবে উপলব্ধির জন্য বিহিতভাবে সাধনার দরকার । 'সাধনা' কথাটির অর্থ 'সেধে নেওয়া' । সাধনা ব্যতিরেকে সিদ্ধিলাভ করা বা সিদ্ধকাম হওয়া যায় না ।

শ্বাসচৈতন্য সর্বজীবে সমভাবে বিরাজিত । তা'তে লক্ষ্য স্থির করতে পারলে তখন 'অহং কর্তা' এই দুর্বুদ্ধির বোঝা আর মাথায় চাপে না । তখন ইন্দ্রিয়গুলো ঈশ্বরের দ্বারা পরিচালিত হয় । তখন অহং-বোধ নিমিত্তমাত্ররূপে পরিগণিত হয় । মহাপ্রকাশময় চৈতন্যসত্তা সর্বত্র বিরাজিত । তাই যথোপযুক্ত নামধ্যানের দ্বারা বা সম্যক্ সাধনার দ্বারা যথেচ্ছ বিচরণ বা বিহার করা সম্ভবপর হয় । তখন বলা যেতে পারে-'বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্ম সুদুর্লভঃ অর্থাৎ তখন বাসুদের অর্থাৎ যেগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সর্বত্র বিরাজিত এরূপ উপলব্ধ হয় ।

সাধনা বা তপস্যার শক্তি অপরিসীম । অখণ্ড শক্তি বা ব্যক্তিত্বের অধিকারী হ'তে গেলে তপস্যার একান্ত প্রয়োজন । যা'কিছু অধিক শক্তিসম্পন্ন তত্ত্ব পৃথিবীতে বিরাজমান তার মূল কিন্তু তপস্যা । তাপপ্রদানের দ্বারা সোনা বিশুদ্ধ ও মূল্যবান দ্রব্যরূপে পরিগণিত হয় । সমস্ত ধাতু সামগ্রীকে বিশুদ্ধতার জন্য গলাতে হয় । কাঁচা মাটির খেলনাকেও তাপের দ্বারা শক্ত করা হয় । কাঁচা ইটকে গরমের তাপে তপ্ত করে শক্ত আর লাল করা হয় । সাধারণ কাঁকর তাপের দ্বারা চুনে পরিণত হয় । তাই দিয়ে গড়ে ওঠে বিশালকায় অট্টালিকা, যা বছরের পর বছর দাঁড়িয়ে থাকে তপঃ-সাধনা বা তপস্যার সাক্ষী হয়ে । যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই সমগ্র জগতে

পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন, তাঁতেই সকল বস্তু সন্নিবেশিত হয়ে রয়েছে। তিনি নিজে তাঁর প্রকৃতিকে বশীভূত করে পুনঃপুন প্রতিসৃষ্টিতে জগতের উৎপাদন ঘটিয়ে থাকেন। তিনি নিজে নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত স্বভাবসম্পন্ন হলেও সাধারণ মানুষ তাদের মূঢ়তার জন্য তাঁকে মানুষী তনু ধারণকারী ব'লে বুঝতে না পেরে অবস্থ করে–

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।
পরং ভাবমজনন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ -গীতা ৯/১০

তার নিচের বহুবিধ শক্তিমত্তা, সর্বকর্তৃত্ব, সদাবিদ্যমানত্ব ইত্যাদি বোঝাবার জন্য তিনি একটি মাত্র শ্লোকে যে ভাবে ত্রয়োদশপ্রকারে আত্মপ্রকাশ করেছেন তা ভাবগাম্ভীর্যে অতুলনীয়।

'গতির্ভতা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধাং বীজমব্যয়ম্ ।।

গীতা ৯/১৮

ভাবার্থ–আমিই (জগতের) গতি, পালনকর্তা, প্রভু (নিয়ন্তা), সাক্ষী (শুভাশুভ দ্রষ্টা), রক্ষক, আশ্রয়, সুহৃৎ, স্রষ্টা, সংহারকর্তা, আধার, লয়স্তান, কারণ (এবং স্বয়ং) অবিনাশী।

গর্ভ উপনিষদে এইরূপে বলা হয়েছে–'যদি য্যোঃ প্রমুচ্যে অহং তৎ প্রপ্রদ্যে মহেশ্বরম্ অশুভক্ষয়কর্ত্তারম্ ফলমুক্তিপ্রদায়কম্। যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যে অহং তৎ সাংখ্যম্ যোগম্ অভ্যাসে অশুভক্ষয়-কর্তারম, ফলমুক্তি প্রদায়কম্। যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যে অহং ধ্যায়ে ব্রহ্ম সনাতনম্। 'একবার যদি এই যোনি গর্ভবাস থেকে মুক্ত হই, তবে আমি অশুভ ক্ষয়কর্ত্তা ও ফলমুক্তি প্রদাতা মহেশ্বরের অথবা নারায়ণের শরণাপন্ন হব অথবা ফলমুক্তি প্রদায়ী জ্ঞানযোগের অভ্যাস করব অথবা সনাতন ব্রহ্মের ধ্যানে নিবিষ্ট হব।

অথচ, আমরা দেখতে পাই, -'নানাভাবে যন্ত্রণাপীড়িত অশেষ দুঃখের মধ্য দিয়ে গর্ভস্থ শিশু যখন জ্ঞাত হয়, বৈষ্ণবীয় বায়ু বা মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হয় বলে, তখন আর জন্মমরণাদির কথা স্মরণ করতে পারে না, যোগযুক্ত থাকাও সম্ভবপর হয় না-সেইজন্য শুভাশুভ কর্মের বিষয়ে তার আর সচেতন থাকাও সম্ভবপর হয়ে ওঠে না'।

তাই, কবিগুরুর সুরে সুর মিলিয়ে কারকবিভুরকাছে আমার একমাত্র প্রার্থনা-

'যুক্ত করে হে সবার সঙ্গে
মুক্ত কর হে বন্ধু,
সঞ্চার কর সকল কর্মে,
শান্ত তোমার ছন্দ'।

(গীতাঞ্জলি, ৫, পৃষ্ঠা ১৯)

শুধু খেয়ে পরে বেঁচে থাকার জন্যই তো জীবন নয়। জীবনের আসল উদ্দেশ্য হল আদর্শ চরিত্র গঠন, মানবিক গুণাবলীর

কারক গ্রহ–তারা–চন্দ্র যখন যেমন শুভ রয়।
তেমনি দিনে কাজ আরম্ভে প্রায়ই জানিস শুভ হয়॥

-শ্রীশ্রীঠাকুর

যে কোন বয়সের আপনি বা আপনার সন্তান-সন্ততির কোষ্ঠি, ঠিকুজি বা লাইফ হরস্কোপ তৈরি করিয়ে জেনে নিন আপনার অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি কখন কিভাবে কেমন যাবে এবং আপনার ভাগ্যে কী আছে?

যাজক, লেখক ও জ্যোতিষ গবেষক

শ্রীবিষ্ণুপদ আচার্য্য বি এ

কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতি ও জ্যোতিষতীর্থ

কোষ্ঠি, ঠিকুজি, রত্ন ও হস্তরেখা বিশারদ

অফিসঃ
অক্সফোর্ড স্কুল এন্ড কলেজ সংলগ্ন ২নং রুম
গোলদীঘির উত্তরপাড়, কক্সবাজার
মোবাইল ০১৭১৪৪৩৪৭৫৪

বাড়ীঃ
সৎসঙ্গ শ্রীমন্দির
হারবাং, ধরপাড়া, চকরিয়া
কক্সবাজার।

চাষ কর জীবন ভুঁই

খগেন্দ্রনাথ কয়াল (অধ্বর্য্যু)

বিকাশ ও ঈশ্বর প্রাপ্তি । এই মহৎগুণাবলী অর্জন করার জন্য আজ আমরা বিভিন্ন মতে বিভিন্ন পথে বিভিন্ন আদর্শের অনুসরণ করে সাধনা করছি, চর্চা করছি ও অনুশীলন করছি । আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ করে আমরা যেমন অধিক ফসল ফলাতে পারি তেমনি বিজ্ঞান ভিত্তিক উপায়ে জীবন জমিন চাষ করলে জীবনের আসল উদ্দেশ্যগুলো সফল হতে পারে ।

বর্তমান বিশ্ব বিভিন্ন বাদে বিবাদে ভারাক্রান্ত । কম্যুনিজম, সোসালিজম, ন্যাসিজম, ফ্যাসিজম, রামইজম, কৃষ্ণইজম, বুদ্ধইজম, খ্রিস্টানইজম, অনুকূলইজম বিভিন্ন ism বা বাদের ছড়াছড়ি । আমরা যে যে বাদেরই অনুসারী হই না কেন আসলেই আমরা সবাই জীবনবাদী । আমরা সবাই একটা সুন্দর জীবন চাই । তাই তো বিংশ শতাব্দীর যুগনায়ক যুগাবতার পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র কম্বুক কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন

"যে বাদের তুই হো'সনা বাদী
জীবন বাদী আসলেই তুই,
জীবনটাকে করতে কায়েম
চল চষে চল জীবন ভুঁই ।"

আমরা যে মতের যে পথেরই অনুসারী হই না কেন আসলেই আমরা সবাই জীবনবাদী । আমরা চাই একটা আদর্শ জীবন গড়তে । কিন্তু ইচ্ছা করলেই তো আদর্শ জীবন গড়া যাবে না । আদর্শ জীবন গড়তে হলে একটা আদর্শ জীবনের অনুসারী হতেই হবে । সেই আদর্শ নির্দেশিত বিধি বিধান মেনে চলে জীবন জমিন চাষ করতে পারলে আমাদের জীবনটা ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে উঠবে । আমরা আদর্শ চরিত্রের অধিকারী হয়ে উঠবো । বিজ্ঞান ভিত্তিক উপায়ে কি করে জীবন ভূমি চাষ করতে হবে এই প্রবন্ধে সেই বিষয়ে আলোচনা করবো । অষ্টাদশ শতাব্দীর সাধক কবি রামপ্রসাদ বলেছেন-

"মন তুমি কৃষি কাজ জান না
এমন মানব জমিন রইলো পতিত
আবাদ করলে ফলতো সোনা ।"

আসলে আমাদের মানব জমিন পতিত রয়েছে । আধুনিক বিজ্ঞান পদ্ধতিতে চাষ করলে অবশ্যই সোনা ফলবে । কিন্তু কে শেখাবে সেই চাষ পদ্ধতি? এই চাষ পদ্ধতি শেখানোর জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েছেন যুগাবতারগণ । যেমন সেই পরমেশ্বর এসেছিলেন জেরুজালেমের জলপাইবনে, এসেছিলেন আরবের মরুপ্রান্তরে, এসেছিলেন সারনাথের স্তুপপাদমুলে, লীলা করে গেছেন তিনি মথুরাবৃন্দাবন দ্বারকায় অযোধ্যায়, তাঁর দীব্যলীলায় উদ্ভাসিত হয়েছিল নদীয়ার পথ প্রান্তর, দক্ষিণেশ্বরের মন্দির – আজও আবার উদ্ভাসিত হিমাইতপুরের পুণ্য ভুমি শিউলিতলায় । তাঁরাতো সবাই একই । তাদের মধ্যে কোন ভেদ নেই । তাইতো প্রেমময় ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বলেছেন–

"বুদ্ধ ঈশায় বিভেদ করিস
শ্রীচৈতন্য রসুল কৃষ্ণে,
জীবোদ্ধারে আর্বিভূত হন
একই ওঁরা তাও জানিস নে ।"

আসলে তাঁরা তো সকলেই এক । তারা আসেন, লোক শিক্ষক হয়ে, লোকগুরু হয়ে । তাদের কাছ থেকে সৎ মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে তাদের নির্দেশিত সাধন পদ্ধতি মাফিক যদি আমাদের জীবন জমিন চাষ করতে পারি তাহলে অবশ্যই সোনা ফলবে । কিন্তু বাধা হয়েছে গুরু নির্বাচনে । কে হবেন আমাদের সেই গুরু? বর্তমানে আমাদের সনাতনী কৃষ্টির মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন সম্প্রদায় আর বিভিন্ন গুরু । দেশে যেন গুরুর ছড়াছড়ি । অথচ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেছেন-"জগতে সদগুরু অতি দুর্লভ ।" তাহলে গুরু কে? যিনি যুগে যুগে আসেন তিনিই তো সদগুরু । "যার কোন মূর্ত আদর্শ কর্মময় অটুট আসক্তি সময় ও সীমাকে ছাপিয়ে তাঁকে সহজভাবে ভগবান করে তুলেছে-, "যাঁর, কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান মনের ভালমন্দ বিচ্ছিন্ন সংস্কারগুলিকে ভেদ করে ঐ আদর্শেই সার্থক হয়ে উঠেছে-তিনিই সদ্‌গুরু ।"

(সত্যানুসরণ)

আমরা যে মতের যে পথেরই অনুসারী হই না কেন, আর যে গুরুর দীক্ষিত হই না কেন সদগুরুকে গ্রহণ করলে তাতে গুরুত্যাগ হয় না । তাইতো প্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন-

"পুরুষোত্তম আসেন যখন
সবগুরুরই সার্থকতা,
তাঁকে ধরলে আসে নাকো
গুরুত্যাগের ঘৃণ্যকথা ।"

সদগুরুর স্মরণাপন্ন হও, সৎনাম মনন কর, আর সৎসঙ্গের আশ্রয় নিয়ে তেমনি করেই চলত থাক আমি নিশ্চয়ই বলছি, তোমাকে তোমার উন্নয়নের জন্য ভবতে হবে না ।

(সত্যানুসরণ)

যদি সৌভাগ্যক্রমে সদগুরুর সন্ধান পাওয়া যায় তাহলে স্থানকাল পাত্র সময় কোন কিছু চিন্তা না করে তৎক্ষণাৎ দীক্ষা গ্রহণ করা উচিত । এ প্রসঙ্গে আমাদের মহানির্বানতন্ত্রে বলছে-"যদি ভাগ্যবশে নৈব সিদ্ধ বিদ্যাৎ লভে প্রিয় । তদৈব ত্যান্ত দীক্ষিত ত্যক্ত গুরু ন বিচারম্ ।" অর্থাৎ "যদিভাগ্যবশে সিদ্ধ গুরুর সন্ধান পাওয়া যায় তাহলে গুরুত্যাগের কথা চিন্তা না করে তৎক্ষণাৎ দীক্ষা নেওয়া উচিত ।"

বর্তমানে গুরু নির্বাচন আমাদের বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলেছে । 'কুলগুরু' প্রথার প্রচণ্ড ঝড়ে আমরা যেন ছন্নছাড়া হয়ে যাচ্ছি ।

'কুলগুরু' মানে বংশানুক্রমিক গুরু । গুরুর ছেলে গুরু । একজন শিক্ষকের ছেলে যোগ্যতা অর্জন না করলে যেমন শিক্ষক হতে পারে না, তেমনি একজন গুরুর ছেলে যোগ্যতা অর্জন না করলে কেমন করে গুরু হবে? আমাদের শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় গুরুর ক্ষেত্রে বংশকে কুল বলে না । আমাদের মহানির্বানতন্ত্রে বলছে-"ন কুলং কুল মিত্রাহু কুলং ব্রহ্ম সনাতন ।" অর্থাৎ "বংশকে কুল বলে না সনাতন ব্রহ্মই কুল ।" যুগপুরুষোত্তম প্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র তাই কম্বু কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন-

"তত্ত্ব দ্রষ্টা ঋষি তখন ছিল পুরাকালে,
তাদের আসন করল দখল কুলগুরুর দলে ।
কুল অর্থ বংশ বোঝে কুল গুরুর দল,
গুরুগিরি বংশের পেশা করেছে সম্বল ।
কুল অর্থ বংশ নহে, ব্রহ্ম সনাতন,
ব্রহ্মরাই কৌলগুরু ছিলেন তখন ।
তারাই ছিলেন দীক্ষাদাতা জীবের হিতকারী,
এখন ব্রহ্মজ্ঞানের ধার ধারে না করছে গুরুগিরি ।
গুরুগিরির গুরুদায়িত্ব নয়তো ছেলে খেলা,
ব্যতিক্রমে ডোবে পাপে সংগে নিয়ে চেলা ।
এক অন্ধ পথ দেখাচ্ছে অপর অন্ধজনে,
ভেবে দেখ ফাঁকির খেলা চলছে দেশে দেশে ।"

উপর্যুক্ত বাণীর আলোকে 'কুলগুরু' সম্পর্কে ধারণা আমাদের কাছে নিশ্চয়ই স্পষ্ট হয়েছে । কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমান সৎসঙ্গ জগতে 'কুলগুরু' প্রথার ন্যায় আচার্যদেব প্রথা যেন জগদ্দল পাথরের মতো সৎসঙ্গ সমাজের বুকে চেপে বসেছে । গুরুর ছেলে যেমন গুরু হচ্ছে তেমনি আচার্যদেবের ছেলেও আচার্য হচ্ছে । আমার মনে হয় সৎসঙ্গের ইতিহাসে এটা একটা কলংকময় অধ্যায়ের অবতারণা । আপূরয়মান বৈশিষ্ট্যপালী লোকত্রাতা মহামানব শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন–

"পুরুষোত্তম আসেন যখন,
ইষ্ট আচার্য তিনিই গুরু,
তিনি সবার জীবন দাঁড়া
তিনিই সবার জীবন মেরু ।"

তাঁর এই বাণীর আলোকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, পুরুষোত্তমই ইষ্ট আচার্য ও গুরু । তিনি ছাড়া অন্য কেউ আচার্য বা গুরু হবেন না । তাঁর এই অমোঘ বাণী কী আমরা বাস্তবভাবেই মানি না? তাঁর জীবদ্দশায় তিনিতো আচার্য প্রথার কথা বলেন নি বা আচার্যভৃতির প্রবর্তণ করেননি । অথচ তাঁর মহাপ্রয়াণের পরে আচার্যভৃতির প্রবর্তন হয়েছে কেন? সদ্গুরু বা আচার্য সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর আরও বলেছেন–

স্ত্রীলোকের যেমন দুটি স্বামী হয় না,
দুটি স্বামী মানে-
ব্যাভিচার ও ব্যতিক্রমদুষ্ট হওয়া
পুতঃ আত্মনিয়ন্ত্রণকে
বিক্ষুব্ধ ও দুষ্ট করে তোলা
তেমনি নারী হোক
আর, পুরুষই হোক,
কারো সদগুরু বা আচার্য্য দু'জন হয় না,
দু'জন হওয়া মানেই-
বিকেন্দ্রিক বিকৃতি ও ব্যতিক্রমে
নিজেকে দুষ্ট করে তোলা ।" (আদর্শ বিনায়ক) ।

আমরা যতই দেব দেবতার পূজা করি না কেন গুরু পূজা ছাড়া কোন পূজাই সার্থক হয় না । সর্ব্বদেবময়গুরু' তত্ত্বটা আজ আমাদের ভাল করেই বুঝতে হবে । তাইতো প্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন-

"গুরুপূজা না করলে কিন্তু
কোন দেবতার হয় না পূজা,
সব দেবতার সিদ্ধ আসন
গুরুই কিন্তু তাদের ধ্বজা ।"

অনুকূল দর্শনে পুরুষোত্তমই আচার্য্য বা গুরু । তাঁর বংশের অন্য কেউ আচার্য্য বা গুরু হবেন না । এমন কি দীক্ষাদানকারী ঋত্বিক দেবতাগণও গুরু হবেন না । তাঁরা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাসম । প্রেমময় ঠাকুর বিশ্বজগতে আধ্যাত্মিক পুরুষ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন । আধ্যাত্মিক পুরুষের স্ত্রী পুত্র পরিবার পরিজন থাকলেও ভক্তের কাছে তিনি ঐশ্বরিক গুণসম্পন্ন আধ্যাত্মিক পুরুষ । আধ্যাত্মিক পুরুষের কোন পারিবারিক সম্পর্ক থাকতে পারে না । তিনিই একৈককেবলম । তিনি এক ও অদ্বিতীয় । শ্রীশ্রীঠাকুর তাই আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন-"ধরুন আমি হয়তো নেই । আমার অবর্তমানে আমার ছেলেদের মধ্যে আমার সাদৃশ্য লক্ষ্য করবেন, তাঁদের ভালবাসবেন, আমার থেকে এসেছে বলে, কিন্তু তাঁদের ইষ্ট বলে ভাবতে পারবেন না । (২৪/১১/১৯৪১ খ্রিঃ)

আজ অনুকূল দর্শনের আলোকে আমাদের জীবন চলার সময় এসেছে । তাঁর বংশধরদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হলে ও আমরা পুরুষোত্তমের জীবন ও বাণীকে অবিকৃতভাবেই অনুসরণ করবো । তিনি যে সৎনাম নিয়ে ধরার ধুলিতে অবতীর্ণ হয়েছেন ঋত্বিক দেবতার মাধ্যমে পুরুষোত্তম প্রবর্তিত সেই সৎনাম গ্রহণ করাই আমাদের একান্ত কাম্য । আমি শুরুতেই বলেছি আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যে হল আদর্শ চরিত্র গঠন, মানবীয় গুণাবলী অর্জন ও ঈশ্বর প্রাপ্তি । এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে সৎনামে যুক্ত হয়ে বিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতিতে জীবন ভুঁই চাষ করতে হবে । তাহলে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য অবশ্যই সফল হবে ।

আসুন সমস্ত দ্বিধা দ্বন্দের অবসান ঘটিয়ে আদর্শ জীবন গঠনে যুগাবতার যুগপুরুষোত্তম প্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের প্রদত্ত সৎমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে বিধিমাফিক জীবন ভুঁই চাষ করতঃ সুরত সাধনায় মত্ত হয়ে ঈশ্বর প্রাপ্তির পথকে সুগম করে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে সমস্বয়ে বলে উঠি বন্দেপুরুষোত্তম্ ।

স্বপন কুমার দত্ত

কবিতা

সেইতো তুমি
অনেক দিনের চেনা,
দিয়েছি অনেক ভালবাসা
তবুও তুমি রয়ে গেলে সেই অচেনা!

মানুষ স্বার্থপর জানি
তবুও মানুষ অমৃতের সন্ধানে,
অবিচল থেকেছে সহস্র বছর ধরে
চাওয়া না পাওয়ার সন্ধিক্ষণে ।
তোমার আচার আচরণ কুৎসিৎ কলঙ্ক পঙ্কিল!
জীবনের স্রোত ধারায় অচিন পাখি,
আত্মিক সম্পর্কে খুব কাছের হয়েও
রয়ে গেলাম তোমার যন্ত্রণার নীরব স্বাক্ষী ।
বিদ্রোহী মনটা প্রতিবাদে কেঁদে ওঠে
সমুদ্র গর্জনের স্রোত ধারার মত,
অনেক আশা-ভালবাসা
কালের স্বাক্ষী হয়ে রইল অবিরত ।

তুমি নিজের দুরাচার বুঝতে পারলে না
মিথ্যে অপবাদের অপঘাতে,
এ হৃদয় করলে ছিন্ন ভিন্ন
তুমি আমার হয়েও রইলে ভিন্ন মতে ।

অহিংসাকে পিছু ফেলে
হিংসার ব্রত পালনে থাকলে অবিরত ।
ধর্ম-অধর্মের হিসাব ভুলে,
রইলে শুধু নিজ অহং প্রতিষ্ঠায় নিয়ত ।
জন্মিলে মরিতে হবে
এ কথাটি সত্য জেনো,
তবে কেন পাপাচারে রত হলে
কর্ম তোমার পিছু রবে এ কথাটি সত্য জেনো ।

জয়গান
গদ্যলাল চক্রবর্তী

বিশ্ব মাঝে কেন এসেছিলে প্রভু!
কেন করিলে এত খেলা!
নিশী দিন ভরি তাই ভেবে মরি,
অন্য সকলি লাগে অবহেলা ।

জীবনের তরে বাঁচিবার লাগি
দিয়ে গেলে কত মন্ত্র,
না দেখে জীব মরিবার লাগি
বলে উঠে সব ভ্রান্ত ।

জেনেছে যারা হয়ে আত্মহারা
বুঝেছে তোমায় স্মরি,
তাদেরি মত যেন হয়ে ওঠে সব
তোমারি আশিষ ধরি ।

তুমি শ্রেষ্ঠ, তুমি প্রেষ্ঠ
তুমি মোদের ভগবান
তোমায় হেরি উঠব গেয়ে
জীবনের জয়গান ।

ভাবের খেলা
গদ্যলাল চক্রবর্তী

জগৎ জুড়িয়া জীবের মাঝে
কত ভাবের খেলা,
সৎ ভাবের পথ হারায়ে জীব
হইছে আত্মহারা ।

সৎ এর সংজ্ঞা নাহি জানে জীব,
চেষ্টা নাহি করে,
তমসার ঘোরে ঘুরে ফিরে মরে
তব মিথ্যা প্রবৃত্তির তরে ।

তুমি দয়াল তব জীবের লাগি
এলে সৎ এর সংজ্ঞা নিয়ে,
তমসার পার করিলে কত
জীবেরে করুণা করে ।

আমিও যখন ঘুরিতেছিলাম
তেমনি তমসা জ্বরে
সে জ্বর তুমি ঘুচিয়ে দিলে
তোমার বাণীর অন্তরালে ।

তাই তোমার চরণে প্রণাম জানাই
হৃদয় আকুল ভরি,
আর নাহি যাতে জগৎ মাঝে
এমনি ভুল করি ।

ভাবকে সবে করে নাও ঠিক
সৎসঙ্গের হাতটি ধরি,
তবেই ভাবটি সঠিক হবে
পরমপিতার আশিষ পরি ।

গোত্র ও প্রবরের তালিকা

গোত্র	প্রবর	গোত্র	প্রবর
অগস্ত্য	অগস্তি, দধীচী, জৈমিন অথবা আগস্ত, দার্ঢ্যচ্যুত, ইম্ববাহ।	কাঞ্চন	অশ্বত্থ, দেবল, দেবরাজ।
অগ্নিবৈশ্য	আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, ভরদ্বাজ।	কণ্ব	কাণ্ব, অশ্বত্থ, দেবল
অত্রি	অত্রি, আত্রেয়, শাতাতপ অথবা আত্রেয়, আর্চনাসা, শ্যাবাশ্ব।	কাণ্বায়ণ	কাণ্বায়ণ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, ভরদ্বাজ, আজমীঢ়।
অনাবৃকাক্ষ	গার্গ্য, গৌতম, বশিষ্ঠ।	ঘৃতকৌশিক	কুশিক, কৌশিক, ঘৃতকৌশিক, অথবা কুশিক কৌশিক, বন্ধুল।
অব্য	অব্য, বলি, সারস্বত।	জামদগ্নি	জামদগ্ন্য ঔর্ব্ব, বশিষ্ঠ, অথবা ভার্গব, চ্যবন, আপ্নুবৎ, ঔর্ব্ব, জামদগ্ন্য
আঙ্গিরস	আঙ্গিরস, বশিষ্ঠ, বার্হস্পত্য	জৈমিনী	জৈমিনী, উতথ্য, সাংকৃতি।
আত্রেয়	আত্রেয়, শীতাতপ, সাংখ্য।	গৌতম	গৌতম, আপসার, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, নৈধ্রুব অথবা গৌতম, আঙ্গিরস, আবাস।
আলম্ব্যায়ন	আলম্ব্যায়ন শালঙ্কায়ন শাকটায়ন।	বশিষ্ঠ	বশিষ্ঠ, পরাশর, আপসার, নৈধ্রুব, বশিষ্ঠ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, অথবা বশিষ্ঠ, অত্রি, সাংকৃতি অথবা বশিষ্ঠ।
পরাশর	পরাশর, শক্তি, বশিষ্ঠ পারাশ্বর্য্য।	বৎস্য, বাৎস্য ও সাবর্ণ	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জমাদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
কাত্যায়ন	অত্রি, ভৃগু, বশিষ্ঠ।	বাসুকি	অক্ষোভ্য, অনন্ত, বাসুকি।
কাশ্যপ	কাশ্যপ, আপসার নৈধ্রুব অথবা কাশ্যপ, আবাৎসার, আসিত।	বিষ্ণু	বিষ্ণু, বুদ্ধি, কৌরব।
কুশিক	বিশ্বামিত্র, দেবরাজ, ঔদস অথবা কুশিক, কৌশিক, বিশ্বামিত্র।	বিশ্বামিত্র	বিশ্বমিত্র, মরীচি, কৌশিক।
কৌ-ন্য	(কৌ-ল্য)-কৌ-ন্য (কৌ-ল্য), স্তিমিক, কৌৎস্য।	শক্তি	শক্তি, পরাশর, বশিষ্ঠ
কৃষ্ণাত্রেয়	কৃষ্ণাত্রেয়, আত্রেয়, আবাস।	শা-ল্য	শা-ল্য, অসিত, দেবল।
গর্গ	গার্গ, কৌস্তুভ, মা-ব্য, অথবা গার্গ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য ও ভরদ্বাজ।	শুনক	শুনক।
গৌতম	গৌতম, বশিষ্ঠ, বার্হস্পত্য।	শৌনিহোত্র	গৃৎসমদ অথবা শৌনক।
বৈরাস্ত্রপদ্য	সাংকৃতি	সাংস্কৃতি	অব্যাহার, অত্রি, সাংস্কৃতি।
বৃদ্ধি	কুরুবৃদ্ধ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য	সৌকালীন	সৌকালীন, আলিঙ্গরস, বার্হস্পত্য, আপসার, নৈধ্রুব।
বৃহস্পতি	বৃহস্পতি, কপিল, পার্বণ।	সৌপায়ন	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
ভরদ্বাজ	ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।	ক্রতু	ক্রতু, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, ভরদ্বাজ।
মঞ্জর্ষি	আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, নৈধ্রুব।	শাকটায়ন	শাকটায়ন, আঙ্গিরস, কৌশিক, বিশ্বামিত্র।

মৌদগল্য	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্লুবৎ ।	সৌপানি	সৌপানি, পুলস্ত্য, ভার্গব, ব্যঞ্জন ।
রথিতর	রথিতর, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য ।	বল্মীক	বল্মীক ।
ক্ষেত্রি	ক্ষেত্রি, আত্রেয়, শাতাতপ ।	সাঙ্খায়ন	সাঙ্খায়ন, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস ।
উপমন্যু	উপমন্যু, আঙ্গিরস, ভরদ্বাজ ।	পাটিন্য	পাঠিন্য ।
জাতুকর্ণ	জাতুকর্ণ, আঙ্গিরস, ভরদ্বাজ ।	বৃহস্পতি	বৃহস্পতি, কপিল, পার্বণা ।
শাকিন	শাকিন, পরাশর, বশিষ্ঠ ।	সাংকৃতি	অব্যাহর, মৈত্রী, সাংকৃতি ।
কাঞ্চনকণ্ঠ	কাঞ্চন, অশ্বথ, দেবল ।	পুনবাসুকি	বাসুকি, আপসার, নৈধ্রুব, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য ।
দিবাকর	দিবাকর, ঔর্ব্ব যমদগ্নি ।	উড়ুম্বর	উড়ুম্বর, অসিত, দেবল ।
অপাবৃক	গার্গ, গৌতম, বশিষ্ঠ ।	প্রবরা	শিব, শম্ভু, (নাথদের) ।
কুন্ড	কুন্ড, আঙ্গিরস, ক্রতব ।	চন্দ্রমাসি	চন্দ্রমাসি, মৌশিকিয়, ধৃতকৌশিক, বিশ্বামিত্র, দেবরাজ ।
শক্র	শক্র, বশিষ্ঠ, পরাশর ।		
ভার্গব	ভার্গব, চ্যবন, আপ্লুবৎ, ঔর্ব্ব, যমদগ্নি ।		
সাংকৃতি	অব্যাহর, মৈত্রি, সাংস্কৃতি ।		
কৃষ্ণাজিত	কৃষ্ণাজিত, পুলস্ত্য ।		
বৈশ্যম্পায়ন	বৈশ্যম্পায়ন, আত্রেয়, বশিষ্ঠ ।		
মৈত্রবরুণ	মৈত্রবরুণ, আত্রেয়, বশিষ্ঠ ।		
পৈলস্তা	পুলস্ত্য, মহেন্দ্র, পৌরুষ ।		
শিবগোত্র	শিব, শক্র, সরোজ, ভূধর, আপ্লুবৎ ।		

আহ্বান

ইষ্টপ্রাণেষু দাদা/ মা

রা-নন্দিত জয়গুরু । প্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের অবারিত করুণায় পরমতীর্থধামে প্রতিদিনই বহু তীর্থযাত্রীর শুভাগমন ঘটে । এছাড়া আশ্রমে নিয়মিত ভক্তবৃন্দ এবং অবস্থানরত ছাত্রগণের দৈনন্দিন আনন্দবাজারের ব্যয় সংকুলানের ব্যাপারটি বেশ কঠিন হয়ে উঠেছে, সেক্ষেত্রে সারাদেশে অবস্থিত ইষ্টপ্রাণ সুযোগ্য ভক্তবৃন্দের অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে কিছু দায়িত্বগ্রহণ করতে পারেন । বছরের প্রতিদিনই অর্থাৎ ৩৬৫ দিনই জনপ্রতি ১দিন কেন্দ্রীয় আশ্রমে আনন্দবাজারের প্রসাদের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংযোগ করলে আশ্রমের অর্থনৈতিক সাশ্রয় ঘটবে এবং দায়িত্ব গ্রহণকারীর প্রতিও পরমপিতার কল্যাণ অবারিত বর্ষিত হবে ।

তাঁর এই করুণাধারায় মিলিত হবার জন্য সবার কাছে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি ।

বিনয়াবনত–

শ্রীবিমল রায়চৌধুরী
সভাপতি
শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ

ড. শ্রীরবীন্দ্রনাথ সরকার
সাধারণ সম্পাদক
শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ

শ্রীশ্রীঠাকুর কথিত শব্দের ব্যাখ্যা

বাগার্থ-দীপিকা থেকে সংকলিত ধারাবাহিক

(পূর্ব প্রকাশের পর)

লোকহিতী [সমাজ-সন্দীপনা, ২১৪]-লোকের হিত যাতে হয়, লোকমঙ্গলপরায়ণ। অনুরূপ শব্দ 'গণহিতী'। [হিত (মঙ্গল)+ইন্ (তদ্‌যুক্ত অর্থে)=হিতী]

লোকানুভাবিতা [আশিসবাণী ১ম, ৫৭]-লোকপালনী Sentiment(ভাবানুকম্পা)। [লোক অনুভাবিতা] । দ্রষ্টব্য 'অনুভাবিতা'।

লোকায়ত্ত [সমাজ-সন্দীপনা, ৪৮৭]-লোক-কর্ত্তৃক আয়ত্ত popular, achieved by the people.

লোকায়ত্ত শাসন [বিধান-বিনায়ক, ১০৯]-বিহিত গণতান্ত্রিক শাসন।

লোকায়ত্তী [আচার চর্য্যা ১ম, ৩৮৩]-লোকের কাছে সহজলভ্য হওয়ার রকম সৃষ্টিকারী।

লোকায়িত [সম্বিতী ৩য়, বিধি, ১৪২]-মানুষের বুদ্ধিগ্রাহ্য। [লোক+ক্যঙ্+ক্ত]

লোকার্থ [অনুশ্রুতি ৩য়, সেবা, ৪৫]-লোকের প্রয়োজন। [লোক+অর্থ]

লোপন[আদর্শ বিনায়ক, ১৭১]-লোপকারী। [লুভ্(লোপ+অন্(কর্ত্তরি)]

লোভজৃম্ভী[আদর্শ-বিনায়ক, ১০৪] -লোভের প্রকাশ যার মধ্যে থাকে, প্রলুব্ধকারী। দ্রষ্টব্য 'জৃম্ভী'।

লোভনা[প্রীতিবিনায়ক ১ম, ২৫১]-লোভের বিষয় বা বস্তু ।[লুভ্ (লোভ)+অনট্ +আপ্] লোলক্রিয়-শিথিল বা নিষ্ঠাহীন ক্রিয়া-যুক্ত। [লোল=চঞ্চল]

লোহ[অনুশ্রুতি ৩য় বিবাহ, ৪৪]-রক্ত।-"সমান লোহের বিক্ষোভেতে হয়ই বংশের অপচয়।"

লোহদীপনা [যাজীসূক্ত, ১৫৪]-(বংশগত) রক্তধারা।

লোহদুষ্ট [বিধান-বিনায়ক, ৩১২]-রক্তদুষ্ট।

লোহশীত [আশিসবাণী ১ম, ১০]-শীতল অশ্রুধারা। [লোহ<লোত=অশ্রু]-"অবিরল রক্তস্রোতে লোহশীতে থেমে যাক--মলিন বিপত্তি।"

শ

শক্তিম [পথের কড়ি, ৪২]-শক্ত ভাব আছে যার মধ্যে। [শক্ত+ইমন্]

শক্তি-সংরেখা [বিজ্ঞান-বিভূতি, ৫৭]-Lines of (magnetic) force.

শক্তি-সঙ্গর্ভী [সমাজ-সন্দীপনা, ৪৮৯]-শক্তি (energy) সংগর্ভিত (impregnated) হয়ে আছে যেখানে। দ্রষ্টব্য 'সঙ্গর্ভী'।

শক্তিসঞ্জিত [বিজ্ঞান-বিভূতি, ৫৮]-শক্তি সম্যক বিজিত (অর্থাৎ অন্তর্ভুক্ত-কৃত) যেখানে, শক্তিমান। [সম্-জি(জয়)+ক্ত=সঞ্জিত]। -"সৃষ্টি হল শক্তিসঞ্জিত পরাৎপর অণু।"

শঙ্কাতঙ্কিত [কৃতিবিধায়না, ৮২]-শঙ্কার দ্বারা আতঙ্কিত। [শঙ্কা+আতঙ্কিত]

শঙ্কাধুধুক্ষু [স্বাস্থ্য ও সদাচারসূত্র, ৬৯]-শঙ্কায় অত্যধিক ক্লিষ্ট। [ধুক্ষ (ক্লেশ)+যঙ্+উ=ধুধুক্ষু -অতি ক্লেশপীড়িত]

শঙ্কানুকম্প [ধৃতিবিধায়না ১ম, ৩৬১]-শঙ্কাহেতু অনুকম্পাপ্রার্থি যে ।[শঙ্কা+অনুকম্প]

শঙ্খ-বর্তনা[আশীষ-বাণী ১ম, ৩৯]যা'শান্ত করে তোলে এমনতর চলন বা স্থিতি। [শঙ্খ=শম্ (শান্ত হওয়া}+খ (কর্ত্তরি)]। দ্রষ্টব্য 'বর্ত্তনা।

শতদ্রু-(১)শতভাবে দ্রাবিত বা চারিত করে যা' [আদর্শ-বিনায়ক, ১৪০]; (২) শতমুখী ধাবমানতা [তপোবিধায়না ২য়, ১৮৩]। [শত-দ্রু (গতি, পলায়ন, ক্ষরণ)+কু (কর্ত্তরি)]-"সংঘাতের শতদ্রু অতিক্রম করে।"

শমীভাব [কথাপ্রসঙ্গে ২/৪]-শান্ত নিস্তরঙ্গ অবস্থা। [শম=শান্তি, তার থেকে শম আছে যেখানে এই অর্থে শম্+ইন্=শমী]

শম্বুক-ধর্ম্মী[আচারচর্য্যা ১ম, ২৬]-শামুকের মতন অতিধীরগতিসম্পন্ন।

শরজাল [চর্য্যাসূক্ত, ১৪৫]-একসঙ্গে নিক্ষিপ্ত অসংখ্য তীর (আঘাত)। -"আগুনের জ্বালাময়ী আত্মঘাতী শরজাল।"

শরণীয় [আদর্শ-বিনায়ক, ৬৪]-শরণযোগ্য, রক্ষা করে চলার যোগ্য। [শৃ (রক্ষা+অনীয়]

শরদ-সঙ্গীত [আশিসবাণী ১ম, ৪৫] -শরদ একপ্রকার বীণাযন্ত্র, তা' হতে উত্থিত গীতধ্বনি।

শাণ্ডিল্য-স্থণ্ডিল [বিধান-বিনায়ক, উদ্বোধনী বাণী]-শাণ্ডিল্যঋষির পূত বেদী। [স্থ্-ল=যজ্ঞার্থে সংস্কৃত ভূমি]। শ্রীশ্রীঠাকুর শাণ্ডিল্যগোত্রে আবির্ভূত। আবার, শাণ্ডিল্যঋষি ভক্তিশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক। এ যুগে শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তিমার্গে চলারই

নির্দেশ দিয়েছেন । তাই তাঁর বাণী, "আমার ঋক্-সত্তা শাণ্ডিল্য-স্থণ্ডিলে দাঁড়িয়ে আহূতি-আহবে ডাকছে ।"
শাতন [সমাজ-সন্দীপনা, ৫০৮] -বিশীর্ণ বা ছিন্ন করে তোলে যা, [শদ ছেদন, পাতন, বিশীর্ণকরণ)+অন্(কর্ত্তরি)]
শাতন -অভিদীপনা [বিধান-বিনায়ক, ২৩২]-ছেদশীল অভিদীপনা, বিনাশকারী সম্বেগ । দ্রষ্টব্য 'অভিদীপনা' ।
শাতন-তপা দেবীসূক্ত, ১৩৫]-বিচ্ছেদ ও বিনাশ যাতে আনে এমন কর্ম্ম-কারী ।
শাতন-তমঃ [অনুশ্রুতি ৪র্থ, আদর্শ, ১৪] -ভয়ঙ্কর আঁধার, তীব্র বিপর্য্যয় ।
শাতন-দীপনা [চর্য্যাসুক্ত, ৩৪]-শয়তানের (ধ্বংসের) দীপ্তি
শাতন-নিলয় সেবা-বিধায়না,২১৩]-শয়তানের আবাস । [নিলয়=বাড়ী, গৃহ]
শাতন-পরিচর্য্যা দেবীসূক্ত,১৩৫]-শয়তানের সেবা ।
শাতন-প্রেরণা [বিবিধ-সূক্ত, নীতি, ৭১]-শয়তানী প্রেরণা ।
শাতন-সংঘাত [দেবীসূক্ত, ৫১]-শয়তানের আঘাত ।
শাতনিক[সমাজ-সন্দীপনা, ৪৯৯]-ছেদনশীল, বিচ্ছেদসৃষ্টিকারী, [শাতন+ঠক] ।-"হয়তো---এড়িয়েও যেতে পার ঐ শাতনিক নির্য্যাতন হ'তে ।"
শাতনী [তপোবিধায়না ১ম, ৪৬]-শাতন এর ভাবযুক্ত, শয়তানী, [শাতন+ইন্ (অস্ত্যর্থে)]-"শাতনী পরিক্রমাকে শায়েস্তা করে ।"
শান্তা [সদবিধায়না ১ম, ১১২]-শান্তিদাতা । [শম্ (উপশম, স্থিরীকরণ)+তৃচ্ (কর্ত্তরি)]
শান্তি [অনুশ্রুতি ৩য়, সংজ্ঞা, ২৮]- (মনের সাম্যভা) । [শম্ +ক্তি (ভাবে)]
শাম্ভবী ছন্দ [তপোবিধায়না ২য়, ২১৮]-কল্যাণ-সংসৃজনী ছন্দ । [শম্ (কল্যাণ)-ভূ(হওয়া)+উ (অপাদানে)=শম্ভু-যাঁর থেকে কল্যাণ হয়, শম্ভু+স্ণ=শাম্ভব, শাম্ভব+ইন=শাম্ভবী-কর্য্যাণসৃষ্টিকারী ।]
শায়ন-তাৎপর্য্য [দর্শন-বিধায়না, ১১২]-অবস্থিতি । [শী (শয়ন্)+ণিচ্+অনট্=শায়ন-শয়ন বা অবস্থান করানোর ভাব]
শারদ-সঙ্গীত [আশিসবাণী ১ম, ৪৫]-সংরক্ষণী গীতি । [শৃ(রক্ষা)+অদ্=শরদ্, শরদ্ +অণ্= শারদ (রক্ষাকারী)] । তুলনীয় ঃ সংস্কৃত 'শরদ্, আবেস্তা]
শারদা [আশিসবাণী ২য়, ৮৬]-হিংসাকে নিহত করে রক্ষাকে সম্বুদ্ধ করে তোলেন যিনি । [শৃ(হিংসা, রক্ষা)+অদ্+আ]
শারীরকোষ-বয়স [বিধি-বিন্যাস, ৪৪৩]-শারীরবিধানের কোষগুলির স্থিতিকাল, -"তাদের বোধিবয়সও শারীরকোষ-বয়স থেকে খিন্ন হয়ে চলেছে ।"
শালীনতা [দেবীসূক্ত, ১১৩]-(কেন্দ্রায়িত চলন) । [শল্ (গমন, সংবরণ)+ঘঞ্+আপ্+শালা, শালা+খঙ্+তল(ভাবে)]
শালীন্য [ধৃতিবিধায়না ১ম ২২১]-বিনয়, শিষ্টতা, নীতিবোধ, সমৃদ্ধি । [শাল্ (প্রশংসা)+ণিন্ (কর্ত্তরি)+যৎ(ভাবে)]
শালীন্য-দীপনা [তপোবিধায়না ১ম, ১৪১]-চলা-বলা ও আচার -ব্যবহারের দীপ্তি ।
শালীন্য-সৌন্দর্য্য [আশিসবাণী ১ম, ৪৭]-অভ্যাস, ব্যবহার ও চরিত্রের সৌন্দর্য্য ।
শাস্তা [সদ্বিধায়না ১ম, ১১২]-শাসনকারী, শাস্তিদাতা । [শাস্ (শাসন)+তৃন্ (কর্ত্তরি)]
শিক্ষা[শিক্ষাবিধায়না,৮]-জীবনে ও চরিত্রে সর্ব্বতোভাবে যোগ্য হয়ে ওঠা, দক্ষতা লাভ করা । [শিক্ষ্+অ+আ] ।
শিক্ষ্ সনন্ত শক্ (শিক্ষ্) হইতে উৎপন্ন । শক্=শক্তি, সামর্থ্য, যোগ্যতা, সেবা । দ্রষ্টব্য ঃ মনিয়র উইলিয়ামস্, ডব্লিউ, ডি.হুইটনি-কৃত সংস্কৃত -ইংরাজী অভিধান ।
শিখা-সন্দীপনা[শিক্ষা-বিধায়না, ১৪২]-জ্বলন্ত প্রেরণা । [শিক্ষা=চূড়া, মূর্দ্ধা] । -"তাইই কিন্তু শিক্ষার শিখা-সন্দীপনা ।" লক্ষণীয়ঃ সংস্কৃত 'শিক্ষা'=বাংলা 'শিখা' । তাই, এখানে শিখা-র মধ্যে শ্রেষ্ঠ উজ্জ্বলতার সঙ্গে শিক্ষা-শব্দের তাৎপর্য্যও নিহিত ।
শিঞ্জন-বিকিরণী [নিষ্ঠা-বিধায়না, ১০৯]-ঝঙ্কার-সৃষ্টিকারী । [শিঞ্জ্ (অব্যক্তধ্বনি)+অনট্ইশঞ্জন]
শিঞ্জিত [নিষ্ঠা-বিধায়না, ১০৯]-রণনদীপ্ত, ঝঙ্কৃত । [শিঞ্জ্+ক্ত]
শিথিলনিষ্ঠ [সম্বিতী ২য়, নীতি, ৮]-নিষ্ঠা যার শিথিল হয়ে পড়েছে ।
শিব [ধৃতিবিধায়না ১ম, ১২১]-সর্ব্বার্থ-অন্বিত শুভ যেখানে মুর্ত্ত ।
শিবদ [বিকৃতি-বিনায়না, ৩৪৮]-মঙ্গলদায়ক । [শিব (কল্যাণ)-দা (দান)+ক(কর্ত্তরি)]-"অমনতর চলন---শিবদ হয়ে উঠবে না ।"
শিবদসিন্ধু [সমাজ-সন্দীপনা, ৪৮৯]-কল্যাণদানকারী সমুদ্রস্বরূপ ।
শিবধৃতি [আশিস্বাণী ২য়, ৮৬]-মঙ্গলজনক ধারণপোষণী ক্রিয়া ।
শিষ্ট [অনুশ্রুতি ৬ষ্ঠ, চরিত্র, ৮] -(অনু)শাসিত, বৈধ বিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । [শাস্ (শাসন, ইচ্ছা, স্তুতি)+ক্ত]

প্রার্থনার সময়সূচি

(বাংলাদেশ সময়ানুসারে প্রাতঃকালীন প্রার্থনা সূর্যোদয়ের ৩০ মিনিট পূর্বে এবং সন্ধ্যাকালীন প্রার্থনা সূর্যাস্তের সাথে সাথে)

মাসের নাম	তারিখ / সময়	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১
জানুয়ারি	প্রাতঃ	৬.২২	৬.২২	৬.২২	৬.২৩	৬.২৩	৬.২৩	৬.২৩	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৩	৬.২৩	৬.২৩	৬.২২
	সন্ধ্যা	৫.২৮	৫.২৮	৫.২৯	৫.৩০	৫.৩০	৫.৩১	৫.৩২	৫.৩২	৫.৩৩	৫.৩৪	৫.৩৪	৫.৩৫	৫.৩৫	৫.৩৬	৫.৩৭	৫.৩৭	৫.৩৮	৫.৩৯	৫.৩৯	৫.৪০	৫.৪০	৫.৪১	৫.৪২	৫.৪২	৫.৪৩	৫.৪৪	৫.৪৫	৫.৪৬	৫.৪৬	৫.৪৭	৫.৪৮
ফেব্রুয়ারি	প্রাতঃ	৬.২২	৬.২১	৬.২১	৬.২১	৬.২০	৬.২০	৬.২০	৬.১৯	৬.১৮	৬.১৭	৬.১৭	৬.১৭	৬.১৬	৬.১৬	৬.১৫	৬.১৪	৬.১৪	৬.১৩	৬.১২	৬.১১	৬.১১	৬.১০	৬.০৯	৬.০৮	৬.০৭	৬.০৬	৬.০৬	৬.০৫			
	সন্ধ্যা	৫.৪৯	৫.৪৯	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫১	৫.৫২	৫.৫২	৫.৫৩	৫.৫৪	৫.৫৪	৫.৫৫	৫.৫৫	৫.৫৬	৫.৫৬	৫.৫৭	৫.৫৭	৫.৫৮	৫.৫৯	৫.৫৯	৬.০০	৬.০০	৬.০১	৬.০২	৬.০২	৬.০২	৬.০৩	৬.০৪	৬.০৪			
মার্চ	প্রাতঃ	৬.০৪	৬.০৩	৬.০২	৬.০১	৬.০০	৫.৫৯	৫.৫৮	৫.৫৭	৫.৫৬	৫.৫৫	৫.৫৪	৫.৫৪	৫.৫৩	৫.৫২	৫.৫১	৫.৫০	৫.৪৯	৫.৪৮	৫.৪৭	৫.৪৬	৫.৪৫	৫.৪৪	৫.৪৩	৫.৪২	৫.৪১	৫.৪০	৫.৩৯	৫.৩৮	৫.৩৭	৫.৩৬	৫.৩৫
	সন্ধ্যা	৬.০৫	৬.০৫	৬.০৬	৬.০৬	৬.০৭	৬.০৭	৬.০৮	৬.০৮	৬.০৮	৬.০৯	৬.০৯	৬.১০	৬.১০	৬.১১	৬.১১	৬.১১	৬.১২	৬.১২	৬.১২	৬.১৩	৬.১৩	৬.১৪	৬.১৪	৬.১৫	৬.১৫	৬.১৫	৬.১৬	৬.১৬	৬.১৬	৬.১৭	৬.১৭
এপ্রিল	প্রাতঃ	৫.৩৪	৫.৩৩	৫.৩২	৫.৩১	৫.৩০	৫.২৯	৫.২৮	৫.২৭	৫.২৬	৫.২৫	৫.২৫	৫.২৩	৫.২২	৫.২১	৫.২১	৫.২০	৫.১৯	৫.১৮	৫.১৭	৫.১৬	৫.১৫	৫.১৫	৫.১৪	৫.১৩	৫.১২	৫.১২	৫.১১	৫.১০	৫.১০	৫.০৯	
	সন্ধ্যা	৬.১৮	৬.১৮	৬.১৮	৬.১৯	৬.১৯	৬.২০	৬.২০	৬.২০	৬.২১	৬.২১	৬.২২	৬.২২	৬.২২	৬.২৩	৬.২৩	৬.২৩	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৬	৬.২৬	৬.২৭	৬.২৭	৬.২৭	৬.২৮	৬.২৮	৬.২৮	৬.২৯	
মে	প্রাতঃ	৫.০৮	৫.০৮	৫.০৭	৫.০৬	৫.০৬	৫.০৫	৫.০৪	৫.০৪	৫.০৩	৫.০৩	৫.০২	৫.০২	৫.০১	৫.০০	৫.০০	৪.৫৯	৪.৫৯	৪.৫৮	৪.৫৮	৪.৫৭	৪.৫৭	৪.৫৬	৪.৫৬	৪.৫৬	৪.৫৬	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫
	সন্ধ্যা	৬.২৯	৬.৩০	৬.৩০	৬.৩০	৬.৩১	৬.৩১	৬.৩২	৬.৩২	৬.৩৩	৬.৩৩	৬.৩৪	৬.৩৪	৬.৩৫	৬.৩৫	৬.৩৬	৬.৩৬	৬.৩৭	৬.৩৭	৬.৩৮	৬.৩৮	৬.৩৯	৬.৪০	৬.৪০	৬.৪১	৬.৪১	৬.৪১	৬.৪২	৬.৪২	৬.৪২	৬.৪৩	৬.৪৩
জুন	প্রাতঃ	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৬	৪.৫৬	৪.৫৬	৪.৫৭	৪.৫৭	
	সন্ধ্যা	৬.৪৩	৬.৪৪	৬.৪৪	৬.৪৪	৬.৪৫	৬.৪৫	৬.৪৬	৬.৪৬	৬.৪৬	৬.৪৭	৬.৪৭	৬.৪৮	৬.৪৮	৬.৪৯	৬.৪৯	৬.৪৯	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫১	৬.৫১	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	
জুলাই	প্রাতঃ	৪.৫৭	৪.৫৮	৪.৫৮	৪.৫৯	৪.৫৯	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০১	৫.০১	৫.০২	৫.০২	৫.০২	৫.০২	৫.০৩	৫.০৩	৫.০৩	৫.০৪	৫.০৪	৫.০৪	৫.০৫	৫.০৫	৫.০৫	৫.০৫	৫.০৬	৫.০৬	৫.০৭	৫.০৭	৫.০৮	৫.০৮	৫.০৯
	সন্ধ্যা	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫১	৬.৫১	৬.৫১	৬.৫১	৬.৫১	৬.৫১	৬.৫১	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০	৬.৪৯	৬.৪৯	৬.৪৮	৬.৪৭	৬.৪৭
অগাস্ট	প্রাতঃ	৫.০৯	৫.১০	৫.১০	৫.১১	৫.১১	৫.১২	৫.১২	৫.১৩	৫.১৩	৫.১৩	৫.১৪	৫.১৪	৫.১৪	৫.১৫	৫.১৫	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৮	৫.১৮	৫.১৮	৫.১৯	৫.১৯	৫.১৯	৫.২০	৫.২০	৫.২০
	সন্ধ্যা	৬.৪৬	৬.৪৬	৬.৪৫	৬.৪৫	৬.৪৪	৬.৪৩	৬.৪৩	৬.৪২	৬.৪১	৬.৪১	৬.৪০	৬.৩৯	৬.৩৯	৬.৩৮	৬.৩৭	৬.৩৬	৬.৩৬	৬.৩৫	৬.৩৪	৬.৩৩	৬.৩৩	৬.৩২	৬.৩১	৬.৩০	৬.৩০	৬.২৯	৬.২৮	৬.২৭	৬.২৬	৬.২৫	৬.২৪
সেপ্টেম্বর	প্রাতঃ	৫.২১	৫.২১	৫.২২	৫.২২	৫.২২	৫.২৩	৫.২৩	৫.২৩	৫.২৪	৫.২৪	৫.২৪	৫.২৫	৫.২৫	৫.২৫	৫.২৫	৫.২৬	৫.২৬	৫.২৬	৫.২৭	৫.২৭	৫.২৭	৫.২৮	৫.২৮	৫.২৮	৫.২৯	৫.২৯	৫.২৯	৫.৩০	৫.৩০	৫.৩০	
	সন্ধ্যা	৬.২৩	৬.২২	৬.২১	৬.২০	৬.১৯	৬.১৭	৬.১৭	৬.১৬	৬.১৫	৬.১৪	৬.১৩	৬.১২	৬.১১	৬.১০	৬.০৯	৬.০৮	৬.০৭	৬.০৬	৬.০৫	৬.০৪	৬.০৩	৬.০২	৬.০১	৬.০০	৫.৫৯	৫.৫৮	৫.৫৭	৫.৫৬	৫.৫৫	৫.৫৪	
অক্টোবর	প্রাতঃ	৫.৩১	৫.৩১	৫.৩১	৫.৩২	৫.৩২	৫.৩২	৫.৩৩	৫.৩৩	৫.৩৪	৫.৩৪	৫.৩৪	৫.৩৫	৫.৩৫	৫.৩৬	৫.৩৬	৫.৩৬	৫.৩৭	৫.৩৭	৫.৩৮	৫.৩৮	৫.৩৯	৫.৩৯	৫.৪০	৫.৪০	৫.৪১	৫.৪১	৫.৪২	৫.৪২	৫.৪৩	৫.৪৩	৫.৪৪
	সন্ধ্যা	৫.৫৩	৫.৫২	৫.৫১	৫.৫০	৫.৪৯	৫.৪৮	৫.৪৭	৫.৪৬	৫.৪৫	৫.৪৪	৫.৪৩	৫.৪২	৫.৪১	৫.৪০	৫.৩৯	৫.৩৮	৫.৩৮	৫.৩৭	৫.৩৬	৫.৩৫	৫.৩৪	৫.৩৩	৫.৩৩	৫.৩২	৫.৩২	৫.৩০	৫.২৯	৫.২৯	৫.২৮	৫.২৭	৫.২৭
নভেম্বর	প্রাতঃ	৫.৪৪	৫.৪৫	৫.৪৫	৫.৪৬	৫.৪৭	৫.৪৭	৫.৪৮	৫.৪৮	৫.৪৯	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫১	৫.৫২	৫.৫২	৫.৫৩	৫.৫৪	৫.৫৫	৫.৫৫	৫.৫৫	৫.৫৭	৫.৫৮	৫.৫৯	৫.৫৯	৬.০০	৬.০১	৬.০১	৬.০২	৬.০২	৬.০৩	৬.০৩	
	সন্ধ্যা	৫.২৬	৫.২৬	৫.২৫	৫.২৪	৫.২৪	৫.২৩	৫.২৩	৫.২২	৫.২২	৫.২১	৫.২১	৫.২০	৫.২০	৫.১৯	৫.১৯	৫.১৯	৫.১৮	৫.১৮	৫.১৮	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	
ডিসেম্বর	প্রাতঃ	৬.০৪	৬.০৫	৬.০৫	৬.০৬	৬.০৭	৬.০৭	৬.০৮	৬.০৮	৬.০৯	৬.১০	৬.১০	৬.১১	৬.১২	৬.১৩	৬.১৩	৬.১৪	৬.১৫	৬.১৫	৬.১৬	৬.১৭	৬.১৮	৬.১৮	৬.১৯	৬.২০	৬.২০	৬.২০	৬.২১	৬.২১	৬.২১	৬.২১	৬.২২
	সন্ধ্যা	৫.১৬	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৮	৫.১৮	৫.১৮	৫.১৮	৫.১৯	৫.১৯	৫.১৯	৫.১৯	৫.২০	৫.২০	৫.২০	৫.২০	৫.২১	৫.২১	৫.২১	৫.২১	৫.২২	৫.২২	৫.২৩	৫.২৪	৫.২৫	৫.২৫	৫.২৬	৫.২৭

প্রস্তুতকারক ঃ শ্রীঅসিতকুমার মণ্ডল (সহ-প্রতিঋত্বিক), সহযোগিতায় ঃ শ্রীঅরবিন্দকুমার মণ্ডল (যাজক), সাতক্ষীরা ।